হাম্মির।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক

শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস

২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কয়েকটি কথা।

আলাউদ্দিনের অব্যবহিত পরেই কে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মত-দ্বৈধ আছে। এল্‌ফিনষ্টোন মবারকের নাম করিয়াছেন, টডের অনুসরণে এ গ্রন্থে মহম্মদকেই বজায় রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি বিভিন্ন ঐতিহাসিকের হাতে বিভিন্ন আখ্যা পাইয়াছেন, অনেকে এরূপ অনুমানও করিয়া থাকেন।

উপন্যাস, ইতিহাস নহে। প্রচলিত ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত ইহার একটু আধটু গরমিল হইয়াই থাকে। তবে বিষম বিপর্য্যয়টা অবশ্যই পরিহার্য্য—এই পুস্তকে এই বিধি লঙ্ঘিত হয় নাই।

নূতন দেখা দিলেও পুস্তকখানা আসলে কিছু পুরান। বহুকাল ধরিয়া ইহা খস্‌ড়ার আকারেই বিদ্যমান ছিল। বৎসরাধিক পূর্ব্বে ইহা পুনর্লিখিত হয়। সেই সময়ে দুই এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর দৃষ্টির উত্তাপ যেন দক্ষিণে বাতাসের মত গ্রন্থের অঙ্গে লাগিয়াছিল। তাই বুঝি এতদিন পরে ইহা পাকিয়া উঠিবার শক্তি ও সুযোগ পাইল।

হামির।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পথ ও প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া রবির কিরণ প্রাসাদের চূড়ায় এখন বসিয়া আছে। অন্তঃপুরস্থ উদ্যানতলে দুইটি রমণীমূর্ত্তি ভিন্ন আর কোন আলোক নাই। বাস্তবিক, সেই দুই মূর্ত্তির মধ্যস্থ শষ্পশ্যাম চত্বরটি যেন দুইধারে আলোকিত একখানা মেঘের মত লাগিতেছিল। কিন্তু মেঘের দুই পাশ ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি বাহির হইলে যেরূপ হয়, ইহা তদ্রূপ নহে। উহার একপ্রান্তে নীহারিকা ও অপরপ্রান্তে তড়িদুন্মেষ থাকিলে যেরূপ হইতে পারে, ইহা সেইরূপ। উভয়েরই রূপের

আলোক ছিল বটে, কিন্তু পরিমাণে ও প্রবলতায় দুয়ে অনেক প্রভেদ। একের পার্শ্বে অন্যটি তাই দিবসের দীপবৎ নিষ্প্রভ। উভয়েই যুবতী, কিন্তু একের যৌবনের স্রোত যেন অপরাকে প্লাবিত করিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথমা অষ্টাদশের ন্যূন নহেন, অপরা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠা। কনিষ্ঠা একটু পরে আসিয়াছিলেন, চত্বর অতিক্রমপূর্ব্বক অপরার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন,—

"এত আগে যে?"

অপরা। আমার রাজ্যে যে শীঘ্রই সন্ধ্যা হয়।

কনিষ্ঠা হাসিয়া বলিলেন, "মনে না বাহিরে?"

অপরা। দুয়েই।

প্রথমা। নিজের মনটা যত হাতধরা দিনটা তত নয়। তুমি মনে মনে সন্ধ্যা সৃষ্টি করিলেই কি সূর্য্যদেব তোমার জন্য খানিকটা ছুটিয়া যাইবেন?

অপরা সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ছুটিয়া না যান, ঢাকা পড়িতে পারেন। কুমারীজি, বুঝিলেন না, আমি যে পাহাড়ের আড়ালে বাস করি।"

বয়োজ্যেষ্ঠার স্বামী রাজসরকারের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। ভোজনের বাহুল্যে ও পরিশ্রমের শৈথিল্যে দেহটা চারিদিকেই খুব ফুলিয়া উঠিয়াছিল। অন্য কাজে না লাগুক, সেই বিপুল শরীরটা পত্নীর উপমাপ্রিয়তার অন্ততঃ খুবই সহায়তা করিত। উপরে তাহারই একটু নমুনা।

কনিষ্ঠা ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "মিছেকথা, আড়ালে নয় শিখরে বল।"

অপরা। যেখানেই থাকি, সন্ধ্যার সময় কিন্তু নামিতেই হয়। এখন আর তাঁহার মাথায় অন্য কিছুই স্থান পায় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, পদ, সম্পদ, পত্নী সব এখন সেখান হইতে সরিয়া পড়ে। থাকে কেবল বাহিরে এক প্রকাণ্ড কাষ্ঠদণ্ড, আর ভিতরে কতকগুলা অপ্সরা আর কিন্নরী।

রসিকার স্বামিদেব ভারি সঙ্গীতপ্রিয়। দিবসের শেষে একবার স্কন্ধে তম্বুরা লওয়াই চাই।

প্রথমা। যাহাই হউক, নামা হয় বলিয়াই এই সময় আমরা একটু পাই। নহিলে অত উচু থেকে তো কাহারও টানিয়া লইবার যো নাই। তবে এখানে সমতল ক্ষেত্রে যখন পাওয়া গিয়াছে, একবার টানার সুখটা অনুভব করিয়া লইলে মন্দ কি ?

এই বলিয়া অষ্টাদশী সঙ্গিনীকে বাহুলতায় বাঁধিয়া শ্যামল চত্বরের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। যেন চম্পক ও আম্রপত্রে রচিত নবীন মঙ্গলমালার একটি অংশ নির্ম্মল নদী বক্ষ দিয়া ভাসিয়া চলিল। সঙ্গিনী প্রথমার হৃদয়দেশ বেড়িয়া কহিলেন,—

"সই, তোমার এ মুক্ত স্রোতের সঙ্গে আমি কেমন করিয়া যাইব। আমার পায়ে যে শিকল বাঁধা।"

প্রথমা। আমি ছিঁড়িয়া দিব।

অপরা। যদি তাহাতে ভাসিয়া যাই ?

প্রথমা। ভয় কি, আমি কূলে তুলিব।

অপরা। সে কেমনতর কূল ?

প্রথমা। সেখানে কত মধু, কত ফুল।

অপরা। মধু মিষ্ট, চাকিতে ভাল; ফুল সুন্দর, দেখিতে ভাল। কিন্তু ইহাতে সব সাধ মিটে না। আর কি?

প্রথমা। পিকরাজ, ভ্রমর—

অপরা তর্জ্জনী দ্বারা ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "শিবের আশীর্ব্বাদে ও কপালের জোরে তাহাও মিলিয়াছে।

রঙ্গময়ীর তানসেন একটু শ্যামবর্ণ।

প্রথমা বলিতে লাগিলেন, "আরও আছে। চন্দ্রমার হাস, মলয়ের শ্বাস, চারু নীলবাস—"

অপরা। খুব হয়েছে। এসব বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিষ নয়। ভারতের কাব্যে এদের বেজায় ছড়াছড়ি। বাড়ীতে দুই এক খানা রাখিয়া থাকি।

দুই জনে এই সময়ে একটা অশোকের তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উপরে সারে বেসারে ফুলের গোছা ঝুলিতেছিল। ইহার মধ্যে যেটা খুব জমকাল, তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কনিষ্ঠা কহিলেন,—

"তোমার মন দেখি কিছুতেই উঠে না। আচ্ছা, ঐ গুচ্ছটা এখন যদি তোমার খোঁপায় আসিয়া বসে?"

অপরা। তাহা হইলে, আমার কেন, ও তো কাহারও মন উঠাতে পারিবে না। এই মোটা ঘোমটার আড়ালে নিজের অস্তিত্ব অবধিই হারাইয়া ফেলিবে। তার চেয়ে এইখানে আসুক, একদিন সাপের মাথায় মাণিকের মত শোভা পাইবে।

এই বলিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার পৃষ্ঠবিলম্বিত দীর্ঘ বেণীটি আদরে তুলিয়া ধরিলেন। কনিষ্ঠা উত্তরে কহিলেন, "দেখো, দংশন করে না যেন।"

অপরা। দংশনে আমার কি ভয়? আমিও সর্পজাতি, হলাম না হয় ঢোঁড়া। আমার উপর বিষ ঢালা, বিষের অপব্যয় মাত্র।

প্রথমা বালিকাবৎ সরল হাস্যে বলিলেন, "না সই, তুমি জলের নও, গাছের সাপ, নহিলে এত উপরে থাকিতে ইচ্ছা কেন? এখন একবার ক্ষিপ্রগতিতে ঐ ফুলটি কাটিয়া আন দেখি?"

অপরা। কাটিতে হইবে না সই, ও আপনিই পড়িবে। অমন দুর্লভ হাতের মধ্যে যদি না আসিয়া ধরা দেয়, তবে ওর ফুলজন্মই যে বৃথা।

প্রথমা। হয়তো ব্যর্থতাই ওর নিয়তি। শুধু ফুটিয়া, ঝরিয়া, বাতাসে উড়িয়া যাওয়াই বুঝি ওর জীবনের কাজ।

শেষ কথা কয়টিতে বয়োজ্যেষ্ঠা একটু ত্রস্তভাবে কনিষ্ঠার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সেই আনন্দোজ্জ্বল নয়নের কোণে একটু যেন নিরাশার ছায়াপাত হইয়াছে। করুণাময়ী বুকের ভিতর কনিষ্ঠাকে চাপিয়া ধরিলেন। দুই সুকুমার হস্তে তদপেক্ষা সুকুমার সহচরীর করপল্লব বাঁধিয়া স্নেহসিক্তকণ্ঠে কহিলেন,—

"ও হতভাগ্য ফুলের কথা ছাড়িয়া দাও। ও কি ছার, এ কর যে ইন্দ্রেরও বাঞ্ছনীয়। রাজবারায় এমন কে আছে, যে ইহার দিকে লোলুপ নয়নে না তাকাইয়া থাকিতে পারে?"

পূর্ণিমার শশাঙ্কের উপর যে একটু জলদের রেখা পড়িয়াছিল, তাহা উড়িয়া গেল। হাস্যময়ী পূর্ব্ববৎ কহিলেন, "দেখ সই, ফুলটার বড় অনলের মত চেহারা, হাতে লইতেও যেন একটু ভয় হয়।"

অপরা। আর অনলবর্ণ ফুলেই বা কাজ কি? শীঘ্র একটা অনলভরা হৃদয়ই তো হাতে লইতে হইবে। তবে যদি আগে হইতেই হাতটা কিছু অভ্যস্ত করিয়া রাখার দরকার হয়, সে আলাদা কথা।

প্রথমা। আচ্ছা সই শান্তা, তোমার তো খুব পাকা হাত। ও হাত দেখিলে ওর পড়িতে কিছু সংশয় হইবে না, জানে, ঠিক ধরিয়া ফেলিবে। একবার পরীক্ষাই কর না?

অপরা। ও তো আর শান্তার প্রিয়তমের প্রাণটুকু নয় যে, ঝুপ করিয়া শান্তার হাতেই পড়িবে। বরং ঐ দেখ, পবন নন্দন থেকে নামিয়া আসিলেন। যাহা হউক, আদিত্যের মধ্যে একটি তো বটে? ওঁরই পূজাটা গ্রহণ কর। দেখিতেছি, ঐ বেয়াড়া ফুলটাকেই বোধ হয় অঞ্জলি দিবেন।

কথা শেষ না হইতেই রসময়ী কনিষ্ঠার হাত টানিয়া বায়ুসঞ্চারে কম্পিত পুষ্পস্তবকের নিম্নে রক্ষা করিলেন। সহসা পত্র ও শাখা ভেদ করিয়া কি যেন একটা তীরের মত বৃক্ষের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। চমকিত হইয়া উভয়েই ঊর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। দেহের সঞ্চালনে হস্ত একটু সরিয়া যাওয়ায়, স্তবকটা কনিষ্ঠার চরণাঙ্গুলি স্পর্শ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঊর্দ্ধ হইতে নয়ন নামিবামাত্র রমণীদ্বয় সচকিতে দেখিলেন সত্য সত্যই কিয়দ্দূরে এক আদিত্যসম, তেজস্বী, সুন্দর, সুঠাম যুবা পুরুষ! যোদ্ধার অপরাপর সজ্জার সঙ্গে তাঁহার বাম ভুজে এক শরহীন শরাসন। অশোকগুচ্ছটির তিনিই যে পাতয়িতা, ইহা বুঝিতে আর প্রমাণের আবশ্যকতা রহিল না। উভয় দৃষ্টি প্রায় একই সঙ্গে সেই কমনীয় অপরিচিতের প্রতি আবদ্ধ হইল বটে; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের প্রয়োগে এক মহা রূপান্তর ঘটিয়া গেল। কেন যে এরূপ হয়, তাহার হেতু বড় রহস্যময়। তবে কি জড়, কি অন্তর্জগতে এই রহস্য নিয়তই দৃশ্যমান হইতেছে।

প্রভাতে সূর্য্য দেখা দিলেন—তরু, লতা, পত্র, পুষ্প, ফল সকলেই একটু হাসিল মাত্র। কিন্তু ঐ যে তড়াগস্থ সামান্য ফুলটি কেবল তো একটু ফাঁকা হাসির দ্বারা তপনের অভিনন্দন করিল না! একেবারে পূর্ণ হৃদয়খানা পাতিয়া দিল, যেন এই জন্য সে সমস্ত রজনী ধরিয়া প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। অন্যের মত প্রভাত তাহার লীলার সামগ্রী নয়। ইহাই তাহার জীবন, সঙ্কল্প ও সিদ্ধি। সুতরাং বস্তুর আবির্ভাব এক হইলেও পাত্র বিশেষে তাহার অনুভূতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দৃষ্টিদ্বয় তাই আগন্তুককে বিভিন্নরূপে অনুভব করিল।

দৃষ্টি বৃত্তির করণস্বরূপ। যে বৃত্তি যে ভাবে তাহাকে চালায়, সে সেইরূপই চলে। প্রেম, ভক্তি, ঘৃণা, বিস্ময়, প্রত্যয়;

সংশয় কাহার না সে দাস? দার্শনিক যাহাকে প্রেম আখ্যা দিয়াছেন, কবি যাহাকে ধনুকধারী দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন, সাদা কথায় যাহা একটা বিচিত্র রহস্যময় আকর্ষণ হঠাৎ সেই জিনিষটা আসিয়া কনিষ্ঠার চক্ষুতে যেন রঙ্গিণ চশমার মত লাগিয়া গেল। সেই সঙ্গে সেই মধ্যবর্ত্তীর অপর পার্শ্বের লক্ষ্য আর না বদলাইয়া যায় কোথায়? তবে ইহাকে প্রেম বলিতে অনেকের আপত্তি। কেহ বলে মোহ, কেহ বলে তৃষ্ণা, কেহ বলে আসক্তি, কত লোকে আরও কতই না বলিয়া থাকে। সে সকলের নিষ্পত্তির এখানে প্রয়োজন নাই। কিন্তু একটা কথা এ সম্বন্ধে অবাধে বলা যায় যে, এই জিনিষটা ভারি বিবেচনাহীন। ইহার মধ্যে একটুও হিসাব, একটুও গণনার গন্ধ নাই। লাভ ও ক্ষতির তুলাদণ্ড খাটান নাই। কৃতক্রিয়তার আনন্দ বা বিফলতার ভয় নাই। আগুন যেমন ভাবিয়া চিন্তিয়া পোড়ায় না, দাহ্য পাইলেই ধরিয়া বসে, ইহা কতকটা সেইরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনব্যাপী তপস্যার ফল আকাঙ্ক্ষিতের চরণে সমর্পণ করে। ভবিষ্যতে রাজা হইব, কি ভিখারী হইব, এ জ্ঞান কিছুই রাখে না। ফলতঃ ইহা যেন নিতান্ত ফলনিরপেক্ষ যজ্ঞ।

কনিষ্ঠার এই ভাবান্তরটুকু প্রেমকলাভিজ্ঞা সহচারিণীর বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাদের ক্রীড়োদ্যান কণ্বাশ্রম না হইলেও, সেখানে দুষ্মন্তশকুন্তলার অন্তর মিলনাভিনয় প্রকটিত হইতে পারে। অনুচ্চস্বরে কনিষ্ঠার কানের কাছে বলিলেন, "সই তুমি যে ভোলানাথের অপেক্ষাও বরপ্রদা হইয়া পড়িলে। বেল গাছের এক ঘা খাইয়া

ভক্তকে তিনি শুধু পাণ্ডবদের শিবিরটাই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তুমি, দেখিতেছি, একটা ফুলের স্পর্শে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিতে বসিয়াছ।”

“আর যাই ছাড়ি, তোমার ঐ চুলের গোছাটা একবার ধরিতে পারিলে, আর ছাড়িব না।”—এই বলিয়া কনিষ্ঠা একটু সপ্রতিভ হইবার প্রয়াস পাইলেন। আগন্তুকের অলক্ষ্যে পূর্ব্ববৎ ক্রীড়াচ্ছলে বিদ্রূপের শাস্তিবিধানার্থ সঙ্গিনীর কেশাকর্ষণ করিতে গেলেন। কিন্তু একি! জগতের সমস্ত লজ্জা ও জড়তা যেন হাতের উপর চাপিয়া বসিল। সঙ্গিনী এবার আগন্তুকের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, “মহাশয়ের লক্ষ্যটা যেমন অভ্রান্ত—পথের জ্ঞানটা বোধ হয় তেমন নয়। এটা যে খাঁটি স্ত্রীরাজ্য।”

আগন্তুক স্মিতমুখে উত্তর দিলেন, “চোর কি আর পথের বিচার করে? যে দিকে সুবিধা পায়, সেই দিকেই আসে।”

সঙ্গিণী। আপনার সুবিধাটা বুঝি খিড়কির দিকেই? অন্তঃপুরের সিন্দুক ভাঙ্গিয়া স্ত্রীধন হরণ করাই বুঝি আপনার পেশা?

আগন্তুক। তাহা নয়, গোধনই করিয়া থাকি। আমাদের দেশের পুরুষগুলো আজকাল প্রায় গোজাতিতুল্য।

সঙ্গিনী। হইতে পারে, কিন্তু আপনার মধ্যেও তো কিছু কেশরিত্ব লক্ষিত হইতেছে না। দেখিতেছি, অরণ্য অপেক্ষা উদ্যানই আপনার প্রিয়তর—মাতঙ্গ অপেক্ষা পত্রপুষ্পশিকারেই আপনি অধিকতর দক্ষ। যাহাই হউক, অনেক শিকারের মত, জানিবেন, ইহাতেও বিপদ আছে।

আগন্তুক। পাছে ফুলের পরাগ আসিয়া চোখে লাগে, এই নাকি?

কথার সঙ্গে সঙ্গে যুবা হাসিয়া উঠিলেন। রসিকা গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, "মহাশয়, হাসিয়া উড়াইবার মত বিপদ বড় হাল্‌কা নয়। শুধু পরাগ লাগা নয় তো, আস্ত ফুলটা আসিয়াই বিঁধিয়া যাইতে পারে। মনে রাখিবেন, ও একটা দেবতার বাণ—এবং সে দেবতাও বড় ক্ষমাশীল নহেন। অনেক বীরের দর্প তিনি ঐ কোমল শরেই চূর্ণ করিয়াছেন।"

এবার আর যুবকের তেমন কথা যোগাইল না। রমণীর শেষ বাক্যে তিনি যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন, যেন একটা আলোকের শলার মত সেই কথাগুলা তাঁহার অন্তরমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। সত্যই যে ভিতরে ঐরূপ একটা দেবতার প্রতিশোধকাণ্ড হইয়া গিয়াছে! সেখানে এমন একটা নবীন বেদনা জাগিয়াছে, পূর্ব্বে যাহা কখনও তিনি অনুভব করেন নাই। এই বেদনাকে তিনি দেখাইবেন, কি লুকাইবেন, ইহা সহসা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু এই অস্থিরতা তাঁহার অন্তঃস্থলটা আরও যেন বেশী সেই আলোকের কাছে ঘুরাইয়া ধরিল। সহচরী যুবককে নিরুত্তর দেখিয়া ভূপতিত পুষ্পগুচ্ছটি তুলিয়া কহিলেন,—

"আমাদের রাজকুমারী জানিতে চাহেন, আপনার এই দানটা রাজসিক না সাত্ত্বিক?"

রাজকুমারী একটু চোক রাঙ্গাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—"জগতে কি আর কিছু জানিবার নাই?"

কিন্তু বাক্য যাহাই বলুক, হৃদয় মুক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "না।"

কনিষ্ঠার পরিচয়ে আগন্তুক বিশেষ চমকিত হইলেন না। পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ আভাস তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি মাটির দিকে ছিল, এক্ষণে তাহা প্রশ্নকারিণীর প্রতি ফিরাইলেন। তাহাতে যে আর পূর্ব্বের প্রগল্‌ভতা নাই, কি এক করুণ প্রার্থনায় তাহা যেন ভরিয়া গিয়াছে। আগন্তুক আবেগপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন, "ক্ষত্রিয় নিজের ধর্ম্ম অপেক্ষা কেমন করিয়া উচ্চতর হইবে? তাহার সমস্ত অনুষ্ঠানের সহিত যে কামনা মিশান।"

এই সময়ে প্রাসাদের এক গবাক্ষপথে ক্ষণেকের তরে একখানা মুখ যেন আবির্ভূত হইল। প্রেমপথের নব যাত্রীদ্বয়ের চক্ষে তাহা অদৃশ্য রহিলেও, সঙ্গিনীর সতর্ক নয়ন দেখিতে ভুলিল না। অমঙ্গলাশঙ্কায় শীঘ্র মিলন ভাঙ্গিয়া দিলেন। আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসারও আর অবসর ও সুবিধা নাই। নিজের এই আচরণে বিস্মিতা রাজকুমারীর সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরাভিমুখিনী হইয়া কহিলেন,—

"অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভ্যাগতকে এখনই বিদায় দিতে হইতেছে। আশা করি, দূতমুখে পরিচয় পাঠাইবেন।"

শেষে একটু হাসিয়া আর একটু যুড়িয়া দিলেন, "দেবতা সুপ্রসন্ন, আপনার কামনা অচিরেই সিদ্ধ হইবে। তাহা ছাড়া, যেমন করিয়াই হউক, অশোক তো সুন্দরীর পদস্পর্শ লাভ করিয়াছে। প্রাচীন কবিদের খাতিরে সেও কোন্ না মিলনের সূচনা করিবে।"

এই বলিয়া সহচরী স্বীয় করস্থ সেই ছিন্ন অশোকগুচ্ছের কিয়দংশ মুগ্ধা রাজকুমারীর অঞ্চলাগ্রে বাঁধিতে বাঁধিতে অবিলম্বে তৎসহ প্রাসাদের দ্বারপথে অন্তর্হিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহচরীর রসাত্মক সহাস্য ইঙ্গিতে যুবকের বদনমণ্ডল প্রথমে আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত ভাব ধারণ করিল। একটু উদ্বেগ ও বিরোধের আভাস ক্রমে যেন গাঢ় ও আয়ত হইয়া তাঁহার দৃষ্টির চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যুবার হৃদয়মধ্যে একটা যে বেশ সংগ্রামের সূচনা হইয়াছে, তাহা পরিস্ফুটরূপেই বোঝা গেল। প্রেমের তরঙ্গে একটা বুঝি বাধা না পড়িলে, তাহার জোর দাঁড়ায় না। হৃদয়প্রস্রবণ হইতে বাহির হইয়াই যুবার প্রণয়নদীকে একটা প্রকাণ্ড পাথরের সহিত লড়াই করিতে হইল। পাথরটা প্রথমে বেশ একটু বল প্রকাশ করিল। কিন্তু নদীর জলও তো একটু হঠে না বা হ্রাস পায় না? সে যে রাগিয়া, ফুলিয়া, মাতিয়া উঠিতেছে। মুক্ত হৃদয়ের আধার হইতে প্রবাহের পর প্রবাহ আসিয়া যোগ দিতেছে। প্রেম অনেক সময়েই এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হয়, কিন্তু হৃদয় যদি শুকাইয়া না যায়, তবে সে সঙ্কট বেশীক্ষণ রহে না। উৎস যদি খোলা থাকে, তবে নদীকে আটকায় কে? তাই প্রথমে একটু বাধা দিলেও পাথরটা ক্রমে হঠিল, তারপর গড়াইল, সর্ব্বশেষে কোথায় যে গিয়া পড়িল, তাহার ঠিকানাই নাই। এই সর্ব্বজয়ী স্রোতের টানে যুবা আত্মহারা হইলেন। দ্বিধাকে পদতলে মাড়াইয়া আকাঙ্ক্ষিতার স্পর্শপূত সেই অশোকগুচ্ছের যে দুই চারিটা দল ভূমিতে পড়িয়াছিল, তাহাই যেন অমূল্য রত্নবোধে তুলিয়া

লইলেন। অতি সমাদরে উষ্ণীষমধ্যে তাহা স্থাপিত করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে প্রাসাদের শিখরস্থ সূর্য্যের সেই শেষ কিরণটুকু সন্ধ্যার বক্ষে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। চারিদিকে প্রকৃতির মুখে একটা আবরণ পড়িয়াছে,—যদিও এখনও তাহা তত গাঢ় হয় নাই যে, একেবারে মুখখানার আকৃতিই দেখা যায় না। উপরে কতকগুলা নক্ষত্র আকাশপথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু এখনও সকলে যোটে নাই। পাখীরা বাসার দিকে সকলেই ফিরিয়াছে, কিন্তু অনেকে এখনও বাসায় পৌছায় নাই। রজনীগন্ধা এখনও সম্পূর্ণ ফোটে নাই, ভ্রমর এখনও সম্পূর্ণ বিদায় লয় নাই, খদ্যোত এখনও সম্পূর্ণ জ্যোতিষ্মান হয় নাই। রজনীর এখনও বাল্যকাল,—যৌবনের পূর্ণতা লাভ করিতে কিছু বিলম্ব আছে।

যুবা আগন্তুক উদ্যান ত্যাগ করিয়া পথিপার্শ্বস্থ যে বৃক্ষের দিকে চলিলেন, তাহার তলে একজন লোক একটি সজ্জিত অশ্বের বল্গা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যুবা তাহার নিকটে আসিলেই অশ্বরক্ষক বিনীত ভাবে তাঁহার হস্তে বল্গা অর্পণ করিল। একটু সস্নেহ সম্ভাষণ মাত্র করিয়াই যুবা অশ্বোপরি আরূঢ় হইলেন। বৃক্ষতলস্থ ব্যক্তি ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল। যথোচিত প্রত্যভিবাদ করিয়াই যুবা অশ্ব চালাইলেন। প্রথমে মন্দগতিতেই যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা পার্শ্বস্থ বনে কি যেন নড়িয়া উঠিল। যুবার অশ্ব চমকিত হইয়া তীরবেগে ছুটিল। তিনি কোন পশুর পদচারণা ভাবিয়া অনুসন্ধানার্থ আর অশ্বের গতি রোধ করিলেন না। নিমেষের

মধ্যে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেলেন। কিন্তু বাস্তবিক সেটা কোন পশু নয়, সহসা একজন অস্ত্রধারী পুরুষ ছুটিয়া আসিয়া বৃক্ষতলস্থ ব্যক্তির উপর লাফাইয়া পড়িল। লোকটা প্রথমে পলাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু যখন সেদিক হইতে আর একজন অস্ত্রধারী আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, তখন সে পলায়নের উদ্যম বৃথা ভাবিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। আক্রমণকারীরা তাহাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিল। পরে একজন অপরকে কহিল, "সে অশ্বে, আমরা পদব্রজে, এখন অনুসরণ বৃথা। ইহাকেই শীঘ্র প্রাসাদে লইয়া চল, কি জানি, কেহ যদি ইহার সহায়তাকারী আসিয়া পড়ে।"

কথার স্বরে ও ভাবভঙ্গিতে বোধ হইল, একজন প্রভু, অপর ভৃত্য। যাহাই হউক, উভয়ে মিলিয়া বদ্ধ ব্যক্তিকে স্থানান্তরে লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারী শিবানীর নিকট হইতে তাঁহার সহচরী শান্তার ফিরিতে সেদিন একটু বিলম্ব হইয়া গেল। হইবারই কথা, এমন একটা ঘটনা প্রতি উদ্যানভ্রমণেই সংঘটিত হয় না। প্রাসাদে আসিয়া তাহার আলোচনা অবশ্যই অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। আবার এই বিলম্বের উপর পুনরায় একটা আটক পড়িল। গৃহে প্রত্যাগমনকালে একটা আলোকিত কক্ষের উন্মুক্ত জানালার দিকে শান্তার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র যাহা তিনি

দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। তাঁহার বোধ হইল, কয়েকজন লোক তাহার ভিতরে থাকিয়া কি যেন পরামর্শ করিতেছে। অন্তদিন হইলে, এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক হইত না। কিন্তু আজ সেই প্রাসাদগবাক্ষে সেই মনুষ্য-মূর্ত্তির সহসা প্রকাশ হইতে শান্তাব মনে একটা আশঙ্কা জাগিতেছিল।

চতুরা ধীরপদে অলক্ষ্যে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। কক্ষস্থ লোকদিগের আকৃতি এবার সুস্পষ্ট চক্ষের সম্মুখে পড়িল। দেখিলেন, মধ্যম রাজকুমার হরিসিংহ একজন অনুচরের সাহায্যে একজন বদ্ধহস্ত বন্দীর উপর তাড়না করিতেছেন। এই কুমারটির নির্দ্দয় স্বভাবের কথা খুব প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার পক্ষে এরূপ আচরণ কিছু অস্বাভাবিক মনে হইল না। শান্তা ফিরিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় হরিসিংহের গর্জ্জন তাঁহার শ্রবণ আকৃষ্ট করিল। তিনি যেস্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহা সম্পূর্ণ নিরাপদ, দুই একটা কথা শুনিয়া যাইলেও কিছু ক্ষতি নাই, এই ভাবিয়া স্থিরভাবে রহিলেন। হরিসিংহ কঠোরকণ্ঠে কহিলেন,—

"জানিতেছ, একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে মুক্তি ?"

বন্দী অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল, "প্রয়োজন হইলে মরিতে জানি, ভয়প্রদর্শনে কোন লাভ নাই।"

হরিসিংহ বুঝিলেন, একটু শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছেন। উপায়ান্তর পরীক্ষার মানসে একটা টাকার থলি হাতে নাড়িয়া কহিলেন, "লাভ আমার না থাক, এই দেখ, তোমার কিছু থাকিতে পারে।"

বন্দী একটু হাসিল। পরে বলিল, "এত ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন, কি জিজ্ঞাস্য আছে বলিয়া যান।"

হরিসিংহ। অশ্বারোহী কে?

বন্দী। কোন অশ্বারোহী?

হরিসিংহ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "এখনও ঢাকিবার চেষ্টা? কিছু পূর্ব্বে রাজোদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কে তোমার অশ্বে আরোহণ করিল?"

বন্দী। তিনি? তিনি একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুত।

হরিসিংহ। উহা যে কেহ দেখিয়াই বলিতে পারিত। আর কিছু সন্ধান চাই।

বন্দী। তবে দেখিতেছি, বৃথা আমার জন্য কষ্ট পাইয়াছেন।

হরিসিংহ। কেন? বলিবেনা? না, জান না?

বন্দী। যদি বলি, বলিব না?

হরিসিংহ উন্মুক্ত তরবারি দেখাইয়া কহিলেন, "ইহার স্বাদটুকু ভোগ করিতে হইবে।"

বন্দী। আর যদি বলি, জানি না?

হরিসিংহ। বিশ্বাস করান বড় কঠিন।

বন্দী। যখন দুইটার একটাও খাটিবে না, তখন এ বিষয়ে আর প্রশ্ন কেন?

দৃঢ়স্বরে হরিসিংহ বাধা দিলেন—"বাচালতা রাখ, কাহার হাতে পড়িয়াছ জান?"

বন্দী পূর্ব্ববৎ অবিচলিত ভাবেই উত্তর দিল, "ব্যাঘ্রের,—দয়ার লেশমাত্রও নাই।"

হরিসিংহ। তবে কেন সাধ করিয়া নিজের মস্তকটা তাহার

কবরে পুরিয়া দিতেছ। তুমি কি বলিতে চাও, সেই অশ্বারোহীর সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই?

বন্দী। আজ্ঞা না, আছে বৈ কি।

হরিসিংহ। কিরূপ?

বন্দী। তিনি প্রভু, আমি ভৃত্য।

হরিসিংহ। নিজ প্রভুর পরিচয় জান না? কতদিন তাহার কাছে আছ?

বন্দী। কেবলমাত্র গত প্রভাত হইতেই তিনি আমাকে এই অশ্বরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

হরিসিংহ। আগে তাহাকে চিনিতে না?

বন্দী। পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

হরিসিংহ। এমন অচেনা লোকের কাজ কি কেহ গ্রহণ করে?

বন্দী। কেবল এক দিনের জন্ত লইতে ক্ষতি কি?

হরিসিংহ এবার একটু ক্ষুব্ধ হইলেন। বন্দীর বাক্যগুলা যেন সত্যের মত লাগিল। তবে কি এটা পণ্ডশ্রম? এবার একটু অন্ত ভাবে কথা পাড়িয়া বলিলেন,—"দেখ, তুমি যাহাকে ঢাকিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহাকে আমি বিশেষভাবেই জানি। অনেকবার তাহার লুণ্ঠনে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছি। শুনিবে সে কে? সে সেই দস্যুনায়ক হামির।"

এই অবধি বলিয়া হরিসিংহ একবার তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা বন্দীর উপর স্থাপন করিলেন। ভাবিলেন, সহসা নামোল্লেখে যদি কোন আভাসে ইঙ্গিতে ধরিয়া ফেলা যায়। কিন্তু বন্দীর চেহারায় একটু স্বাভাবিক বিস্ময় ভিন্ন অন্ত কোন ভাব না দেখিয়া

বলিতে লাগিলেন, "তাহার নাম ধাম বাস্তবিক তোমার কাছে চাহি না। তাহার সন্ধান যদি বলিয়া দিতে পার, তবে মুক্তির সঙ্গে এই পুরস্কার। মনে রাখিও, তাহা না দিলেও আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। তাহার গমনাগমনের পথ আমাদের অজ্ঞাত নহে। এখনই প্রতি পথে তাহার জন্য জাল পাতা হইবে।"

বন্দী এবারে একটু চিন্তামগ্ন হইল। মনের মধ্যে কি যেন একটা তোলাপাড়া চলিল। শেষে একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "সবই যখন জানেন, তখন আর মিছে প্রাণটা কেন হারাই। বেশী দূর যাইবার আর প্রয়োজন নাই। মধ্যরাত্রে এই সহরের দক্ষিণদিকস্থ পান্থশালাতেই তাঁহাকে পাইবেন।"

হরিসিংহ কথাটা একেবারে অবিশ্বাস করিলেন না, তবে খুব বিশ্বাসও করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "বেশ, কিন্তু আজ রাত্রিটা তোমাকে কারাগারেই কাটাইতে হইবে। সাক্ষাৎ প্রমাণে কল্য প্রভাতেই বিদায় দিব। আর যদি শঠতা কর, তার ফল কি বুঝিতেই পারিতেছ।"

বন্দী "তথাস্তু" বলিয়া ঘাড় নাড়িল। ইহার পর সে ঘরের আলোক অন্যত্র সরিয়া গেল। অন্তরালবর্ত্তিনীরও কার্য্য বেশ সুসম্পন্ন হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগত গৃহিণীকে দেখিয়া ত্বরিতহস্তে যন্ত্রস্থাপনপূর্ব্বক কলাবিৎ গণেশপ্রসাদ কহিলেন,—"আজ যে এতটা অনুগ্রহ?"

গৃহিণী শান্তা উত্তর দিলেন, "দিনটা ভারি শুভ, আরো ছুটি মিলিতে পারে।"

গণেশ। বাকি পদটা তবে শেষ করিয়াই ফেলি।

সানন্দে গায়ক তম্বুরার প্রথম তারে অঙ্গুলি অর্পণ করিলেন। কিন্তু সহসা গৃহিণীর কানমলা খাইয়া তারটা এক অস্বাভাবিক চীৎকার সহকারে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় লুটাইয়া পড়িল। গৃহিণী কহিলেন,—

"তুমি পদটা শেষ কর, আমি যন্ত্রটাকেই শেষ করি।"

অনতিবিলম্বেই দুষ্টা সরস্বতী এই অকরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয়ে সাধকের-শীর্ষ হইতে নামিয়া পলায়নপরা হইলেন। অধিকতর নির্যাতন হইতে রক্ষার্থ কলাবিৎ এবার অতি দক্ষ মধ্যস্থের মত তম্বুরাটিকে প্রবোধ দিয়া তাহার নিজের পটগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। পরে বলিলেন, "কাঠের উপর কেন? যদি শাস্তিই দিতে হয়, আদত দুইটি নরম জীবন্ত কান তো সম্মুখেই আছে।"

শান্তা। ঠিক সুরে না বাজিলে সে দুইটিকেও ঠিক করিতে হইবে।

গণেশ। যেমন বাঁধা তেমনই তো আছি। ঢিলও পড়ি নাই, চড়াও হই নাই।

শান্তা। আচ্ছা, দেখাই যাক। বল দেখি, এখন আমার ইচ্ছার স্থর কি?

গণেশ। সপরিবারে এক থাল লুচি আমার পুরোভাগে স্থাপন।

শান্তা। তারপর?

গণেশ। ঐ সুকোমল হস্তে একবার শয্যাটা তোয়াজকরণ।

গৃহিণী বিরক্তিসহকারে কহিলেন, "না নিতান্তই বিগড়াইয়া গিয়াছ। বলিব কি, আমাদের দেশের মেয়েরা নিজের যন্ত্র নিজে বাঁধে না, বোনেদের দিয়াই বাঁধায়, নহিলে ভাল করিয়াই একবার দেখিতাম। এমনি কপাল ভগবান একটা বোনও দেন নাই।"

"তা এত দুঃখের দরকার কি? এই দেখ যন্ত্র নিজের দোষ নিজেই সারিয়া লইতেছে।"

এই বলিয়া কলাবিৎ নিজের কর্ণদ্বয়ে দুইখানি হস্ত রাখিলেন। পুনশ্চ বলিলেন, "বল, কোন সুরে বাঁধিতে হইবে? দেখো যেন বেশী চড়া না হয়।"

শান্তা। ভারি চড়া। এই রাত্রে এখনি তোমাকে সহরের সেই বড় সরাইতে যাইতে হইবে। আর শুধু যাওয়াই নয়, সমস্ত রজনীটি সেখানে না ঘুমাইয়া, না ঢুলিয়া, চক্ষু দুইটি যতদূর সম্ভব খুলিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

গণেশপ্রসাদ চিন্তাযুক্তভাবে মাথা দোলাইয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ এ ছিঁড়িবার মত মোচড় বটে। এ বেয়াড়া সুর কোথা হইতে আনিলে, এটা বুঝি নিতান্ত খেয়ালের?"

শান্তা। যাহাই হউক, এখন চড়িবে কি না?

গণেশ। যদি ছিঁড়িয়া যাই, অন্য যন্ত্র খুঁজিবে না কি?

শান্তা। পথ থাকিলে, দেখা যাইত।

গণেশ। তবে উপায়?

শান্তা। তোমার গোঁপ দাড়িগুলো ছিঁড়িয়া নিজে পরিয়াই বাহির হইব।

গণেশ। তাহাতে আর আমার বেশী লাভ কি? একটা তো যাবেই। তবে কানের বিষয় বরং অনিশ্চিত, তাহা ছাড়া—

এবার একটু থামিয়া, সমাদরে শ্মশ্রুরাজির অভ্যন্তরে কর-বিন্যাস করিয়া বলিলেন, "তাহা ছাড়া, পুরুষ-জন্ম গ্রহণ করিয়া গোঁপের উচ্চত্ব যদি স্বীকার না করা গেল, তবে আর করিলাম কি?"

শান্তা। নহিলে কানের লম্বত্বই প্রকাশ পাইবে। লম্বা জিনিষ তত শক্ত ও ঘাতসহ হয় না। কড়া মোচড়ে ভয় পায়।

গণেশপ্রসাদ দম্ভের ভান করিয়া বুক ফুলাইয়া কহিলেন, "এই লম্বা বপুখানা কি তবে অশক্ত বলিতে চাও? আচ্ছা, তোমার ধারণাটাকে আজ নিশ্চিতই বিপর্য্যস্ত করিব। এখন ব্যাপারটা কি সোজা কথায় বল দেখি?"

শান্তা। সোজাই বলি আর বাঁকাই বলি, জিনিষটার কিছুই রূপান্তর হইবে না। একটা ঘোড়া সাজাইতে বলিব না কি?

বিপুলবপু গণেশপ্রসাদের ঘোড়ায় চড়া বড় ভাল লাগিত না। গৃহিণীর প্রস্তাব উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "নাঃ, এত রাত্রে একটা অবোলা প্রাণীকে আর কষ্ট দিয়া কাজ কি?"

শান্তা টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তাহা বটে, পরকে দিলে নিজেও পাইতে হয়। আর একটু কথা, অন্ধকারে অশ্বের উপর গজভ্রম করিয়া অদ্ভুত উপদেবতা বোধে লোকে সহসা ভয়ও পাইতে পারে। তবে আর বেশী বিলম্বে কাজ নাই। একটু আগে যাওয়াই ভাল। বোঝাই ভড়ের পাড়ি জমিতে কিছু সময়ও লাগিবে।"

শান্তা স্বামীর সম্মুখে একখানি ভোজন পাত্র রাখিয়া পুনরায় কহিলেন, "তুমি খাদ্য ধ্বংস কর, আর আমি বাক্য সৃষ্টি করি। দুইটা কাজ এক সঙ্গেই চলুক, শীঘ্র চুকিবে।"

শান্তা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিতে বসিলেন। বিস্ময়, আশঙ্কা ও আনন্দরসের সহিত গণেশপ্রসাদের কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু অনেক সময় অন্যমনস্কভাবে তিনি একটাকে ধরিতে আর একটা ধরিয়া ফেলিতে লাগিলেন। কবলের সহিত হস্তের স্পর্শও মাঝে মাঝে একটু বেতালা হইয়া পড়িল। গৃহিণী অবশ্য কখন হাস্যে চমক ভাঙ্গাইয়া, কখন শিকারটা ঠিক লক্ষ্যস্থলে দিয়া তালের ত্রুটি অনেকটা শুধরাইয়া লইলেন। অবশেষে যাত্রীর বদনে একটি তাম্বূল-দানের সহিত আর একটু কিছু দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গায়ক গণেশপ্রসাদ অনেক কষ্টে দেহতরীখানা ঠেলিয়া যখন সরাইয়ের কূলে তুলিলেন, তখন সেখানে খুব জমাট মেলা। এই সরাইটা বেশ চকমিলান একতালা বাড়ী। দক্ষিণে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা। সম্মুখের প্রাচীরের মধ্যস্থলে যাতায়াতের বড় দরজা। এই দরজার দুই পাশে ভিতরদিকে দুইটা ছোট খোলা বারাণ্ডা। প্রাঙ্গণ পার হইয়াই দক্ষিণমুখো একটা খুব বড় ঘর। তাহার পার্শ্বস্থ গলি দিয়াই সরাইয়ের ভিতর দিকে যাইতে হয়।

এই বড় ঘরটির ফরাশমোড়া মেজের উপর বসিয়া নানা শ্রেণীর নানা বয়সের লোক নানা কাজ করিতেছিল। কেহ বকিতে-ছিল, কেহ বকাইতেছিল ; কেহ হাসিতেছিল, কেহ হাসাইতেছিল ; কেহ খেলিতেছিল, কেহ খেলাইতেছিল ; আবার কেহ ঢালিতে-ছিল, কেহ খাইতেছিল। কেহ অযত্নে পতিত তম্বুরাটিকে একবার বলাইয়া, কেহ হাতের কাছে তবলাটায় এক ঘা বসাইয়া, কেহ গোপনে বসনে বসনে গ্রন্থি বাঁধিয়া, কেহ অপরের পিটের কাছে হস্তের দ্বারা সর্প রচনা করিয়া, কেহ অন্যের দীর্ঘ কেশ অলক্ষ্যে টানিয়া এবং আকৃষ্ট ব্যক্তি ফিরিলে অতি শান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল, সরস ও নীরস, আরামদায়ী ও পিত্তদাহকর বহুল বিদ্রূপে ও আমোদে প্রায় সকলেই ব্যাপৃত ছিল। এমন কি, যে নিতান্ত উদাসীন সেও একেবারে নিষ্কর্ম্মা ছিল না, বসিয়া বসিয়াই দিব্য

ঢুলিতেছিল। কিন্তু এই ঝোঁকটা কেবল নিদ্রাজনিত নহে, আগে যে ঢালার কথা বলা হইল, তাহার সহিতও ইহা খুব ঘনিষ্ঠভাবেই সম্বদ্ধ। এই ঢালা ব্যাপারটাই এত রকম বেরকমের আমোদের উৎস খুলিয়া যাইবারও অন্যতম—সম্ভবতঃ প্রধানতম কারণ। ফলতঃ কেবল এই ঘরের লোকগুলিই নহে, ভিতরে বাহিরে প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে তরলের সংস্পর্শে একটু তরল হইয়া পড়িয়াছিল।

গণেশপ্রসাদ প্রথমে প্রাঙ্গণ ও ভিতর ঘুরিয়া ঐ বড় ঘরেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এ সব স্থানে বড় আসিতেন না, সহসা তাঁহার আগমনে দুই একজন পরিচিত লোক খুব মাতিয়া উঠিল। ওস্তাদ পাইয়া ভারি আগ্রহ-সহকারে ধরিয়া বসিল। কিন্তু ওস্তাদজী কতকটা রুচির বৈপরীত্যে, কতকটা পাছে মজিয়া গেলে আসল কাজ হারান এই আশঙ্কায় কিছুতেই ঘাড়াইলেন না। ওস্তাদদিগের সনাতন ওজর কণ্ঠের অসুস্থতার দোহাই দিয়া রেহাই পাইলেন। দ্রব পদার্থটিও তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে আসিল। তিনি একটু স্পর্শমাত্র করিয়াই তাহার মান রাখিলেন। শুধু কাজের গরজে এখন নয়, নিজের মেজাজেই গণেশপ্রসাদ সকল সময়েই এই তারল্যময়ীর সহিত মিশিতে কিছু অপটু। নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ ও আলোচনার মাঝখানে তিনি খুব শান্ত ভাবেই রহিলেন। এমন যায়গায় বসিলেন, যেখান হইতে বাহিরের দ্বার বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবেশকালে পান্থশালার কর্ত্তার নিকট জানিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কোন সম্ভ্রান্ত অশ্বারোহী সেখানে আসেন নাই। পল্লীর নিকট

হইতে অশ্বারোহীর বেশ ও আকৃতির যে বর্ণনা পাইয়াছিলেন, তাহার এক কড়ার সাদৃশ্যও কাহারও মধ্যে দেখিতে পাইলেন না। অবশ্য তখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক বিলম্ব ছিল। ষড়যন্ত্রীদিগের উপস্থিতির লক্ষণও কিছু মিলিল না। সুতরাং কিছুক্ষণ গোঁপ-পাকান ও মৎলব-ভাঁজাই ঠিক করিলেন।

কথার স্রোত গড়াইতে গড়াইতে তখনকার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও আসিয়া পড়িল। যখন মদিরামুক্ত কণ্ঠে সকলে নিজ নিজ অভিমত তারস্বরে প্রকাশ করিতে লাগিল, গণেশপ্রসাদ তাহাতে শুধু আমোদ নহে, একটা শিক্ষাও লাভ করিলেন। তিনি বড় একটা সামাজিক গণ্ডগোলে মিশিতে পারিতেন না। বাহিরে কর্ম্মস্থল ও ভিতরে পত্নীর সংসর্গ ছাড়া, তাঁহার আর বড় বেশী আশ্রয় ছিল না। তাঁহার সঙ্গীতচর্চ্চাও প্রায়শঃ তাঁহার বিরামকক্ষের চতুষ্কোণেই আবদ্ধ থাকিত। সুতরাং যাহা কেবল এতদিন শুনিতেন, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। আলোচনা রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গের দিকে ফিরিবামাত্র এত আমোদ ও রসিকতা যেন কোণঠাসা হইয়া গেল। সুরার মোহের মধ্যেও কি এক উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল। আমোদঋজু ভ্রূযুগ সহসা কুটিল হইল, অলস নয়নে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল, ক্রীড়াচপল হস্ত মুষ্টি বদ্ধ করিল। যাঁহারা এতক্ষণ হরিণশাবকের ন্যায় খেলা করিতেছিল, এক্ষণে লাঞ্ছিত কেশরীর মত ফুলিয়া উঠিল। চিতোরের মুক্তিকামী গণেশপ্রসাদের লোচনে এ দৃশ্য বড় সুন্দর লাগিল। কিন্তু তাহা তিনি বেশীক্ষণ ভোগ করিতে পারিলেন না। একবার উঠিয়া পুনরায় প্রদক্ষিণ করিবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রাচীরের দ্বারদেশ

হইতে কি একটা গোলমাল তাঁহার অবহিত কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল।

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গণেশপ্রসাদ তাঁহারই মত আরো অনেক আকৃষ্ট দর্শকের সহিত দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, এক দল নবাগত লোকের সহিত পান্থশালার কর্ত্তার ভারি বচসা সুরু হইয়াছে। দলে প্রায় দশ বার জন লোক, এবং দলটিও কিছু বিচিত্র রকমের। কেহ রাজপুত, কেহ পাঠান, কেহ সুসজ্জিত, কেহ অসজ্জিত অনেকে অশ্বারোহী, দুই একজন পদচারী। বিবাদের কারণ এই যে, তাহারা সরাইয়ে প্রবেশ করিতে চায়, সরাইয়ের কর্ত্তা স্থানাভাবের ওজর দেখাইয়া আপত্তি করে। আসল বিষয়টা এই যে, একেবারে সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে, অপরিচিত লোক বলিয়াই কর্ত্তা তাহাদের স্থান দিতে অনিচ্ছুক। উহারাও কতকটা তাহা বুঝিয়াছিল এবং সহজে সম্মত না হইলে জোর করিয়াই প্রবেশ করিবে এইরূপ ভাব দেখাইতে ছিল। এদিকে সরাইওয়ালাও কেবল একা নহে, কেহ গোপনে কেহ প্রকাশ্যে দর্শকদিগের মধ্যে অনেকেই তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল। গতিক মন্দ দেখিয়া উহাদের মধ্যে যে প্রধান, সরাইওয়ালাকে একটু নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিল এবং মৃদুস্বরে জানাইল যে, এক পলাতক তস্করের অনুসন্ধানে তাহারা আসিয়াছে। তাহাদের ভিতরে যাইতে না দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। কিন্তু সরাইওয়ালা সে কথায় ততটা বিশ্বাস না করিয়া তাহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাওয়ায় দলের নায়ক অগত্যা কি একটা পরোয়ানার মত বাহির করিয়া

দেখাইল। আর বাধা চলেনা দেখিয়া বাধাকারী এবার স্বীকৃত হইল। তবে মুসলমানেরা অবশ্য কেহ ভিতরে যাইতে চাহিল না, তাহারা সেই দ্বারের পার্শ্বস্থ বারাণ্ডায় গিয়া বসিল।

দলের অপরাংশও চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথাও কিছু সন্ধান পাইল না, শেষে তাহারাও আসিয়া সেই বারাণ্ডায় আশ্রয় লইল। ধূমপান ও গল্পগুজবে কিছুক্ষণ কাটিল। রাত্রি ক্রমে বেশী হওয়ায় স্থানীয় লোকেরা সরিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে যাহাদের চাল নাই চুলা নাই, অথবা যাহাদের চাল আছে কিন্তু চুলা ধরাইবার লোক নাই, কিংবা যাহারা চাল, চুলা এবং চুলা ধরাইবার লোক হইতে অনেক দূরে আসিয়াছে, তাহারাই কেবল সরাইয়ের এখানে, ওখানে, সেখানে ঝড়ে-ওড়া খড়ের মত পড়িয়া থাকিল। গণেশপ্রসাদের সব থাকিতেও সন্ধিসূত্রে আজ আর কিছুতেই অধিকার নাই, তাই তিনি দরজার অতি নিকটে স্থাপিত সরাইওয়ালার খাটিয়ায় দেহ বিস্তার করিয়া নাক ডাকাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অন্য দিন যে সুরে নাক ডাকে, আজ সেরূপ ডাকিল না। আজকার ডাকটা যেন কিছু অস্বাভাবিক। সকল ক্ষেত্রেই এই ডাকার সময় চক্ষুর সহিত নাসিকার একটা বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাধারণ নিয়ম, চক্ষু ঘুমাইলে তবে নাসিকা জাগে। কিন্তু গণেশপ্রসাদে আজ ইহার ঠিক উল্টা লক্ষণ দেখা দিল। অর্থাৎ উপাধানের আড়ালে নয়ন দুইটি বেশ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে, অথচ নাসিকার বাঁশি বাজিয়া উঠিল। অন্য দিন একজন কাজ বন্ধ করিলে, তবে অপরে কাজে

লাগে, আজ দুইজনে এক সঙ্গেই লাগিয়া গেল; সুতরাং নবাগত অতিথিদিগের কার্য্যকলাপ তাঁহার আর কিছুই অবিদিত রহিল না। দেখিলেন, কিছুক্ষণ পরে রাত্রি একটু প্রৌঢ়তার দিকে ঝুঁকিলে সেই নায়কটি নিজের দলকে দুই ভাগ করিল। এক ভাগ সেইখানে রাখিয়া অবশিষ্টের সহিত অশ্বারোহণে কোথায় চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ত্রস্তভাবে হামিরের অশ্ব ছুটিলে, পরে যে এমন একটা ব্যাপার হইয়া গেল, তাহার তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। ক্রমে তিনি নগর অতিক্রম করিলেন এবং ইহার পশ্চিম সীমায় যে অরণ্য ছিল তাহারই পার্শ্বে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সেখান হইতে দূরে নগরের সান্ধ্য দৃশ্যে তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইল। হামির পূর্ব্বাভিমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মুগ্ধলোচনে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

সম্মুখে ঐ লোকবিশ্রুত চিতোর। অসংখ্য আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। এখন যেমন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার বক্ষ জুড়িয়া অগণিত দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছিল, অতীত ভেদ করিয়া হামিরের হৃদয়ে কত শত স্মৃতি তেমনি দীপ্তিমতী হইয়া উঠিল। ভূত ও প্রত্যক্ষের মাঝে যে এক বিশাল বিপর্য্যয় দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা যেন বিষধরের ন্যায় তাঁহার মর্ম্মে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা বিঁধিয়া দিল। পূর্ণ জীবনের উচ্চশিখর হইতে পড়িয়া

আজ সে চিতোরের কি দশা! অনাহারে, ক্লেশে, দুঃখে, অভিমানে আজ সে যেন এক মহা শরীরী মৃত্যু! যখন ভাবিলেন, এই মৃত্যুর ভিতরে আবার নূতন প্রাণ আনিতে হইবে, আশায় বীরের অন্তর উচ্ছ্বসিত হইল। নিদারুণ প্রত্যক্ষকে ঢাকিয়া ভবিষ্যৎ মধুর বেশে তাঁহার সম্মুখে দেখা দিল। এই পরিবর্ত্তিত পটের শত সৌন্দর্য্যের মধ্যে হাম্বির দেখিলেন, একটি রমণীমূর্ত্তি যেন জ্যোতির তুলিকায় ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, ঐ মূর্ত্তি না থাকিলে সে পট যেন অপূর্ণ ও ছায়াময়। বনের অন্তরাল হইতে এই সময় একটি সম্ভ্রান্তবেশী লোক আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। নবাগত বনচারী কহিলেন,—"প্রভু, আজ হৃদয় দেখিলেন।"

হাম্বির বিমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার?"

বনচারীর নিকট এ প্রশ্ন যেন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বোধ হইল। পাছে কেহ কিছু স্পষ্ট জানিতে পারে, সেই জন্য তাঁহারা ভ্রমণের কালে প্রায় অলঙ্কারের ভাষায় কথা কহিতেন এবং পরস্পরের সম্বোধনও প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। বনচারী তাই তাঁহাদের অভ্যস্ত ভাষার প্রতি হাম্বিরের এরূপ অন্যমনস্কতা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু আজ ইত্যবসরে একটা যে মহাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা তো বনচারী অবগত নহেন? আজ হৃদয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রভু যে নিজের বুকের দিকেও লক্ষ্য করিতে পারেন, তাহা তিনি কেমন করিয়া ভাবিবেন? কিন্তু হাম্বির তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ শীঘ্র শুধরাইয়া বলিলেন,—

"হাঁ, দেখিয়া মনে হইল দেহের অনুযায়ী বটে।"

বনচারী। ইহা নিশ্চয়ই শুভশংসী। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আপনার আশা অপ্রতিহত দেখিয়াছি। দেশের কেন্দ্র স্বরূপ চিতোরপরিদর্শনে যে তাহা দৃঢ়ীভূত হইল, ইহাতে আর প্রাণে আনন্দ ধরিতেছে না।

হাম্মির। তবে শোণিতের প্রবাহ হৃদয়ে আছে বটে, কিন্তু তাহার উপর এক প্রকাণ্ড প্রস্তর চাপান। এই বাধাটা সরাইতে না পারিলে আর প্রবাহে তেমন জোর দাঁড়াইবে না।

বনচারী। কংসের নিপাত না হইলে কি দেবকীর বুক হইতে প্রস্তর নামিবে?

অপেক্ষাকৃত একটু নিম্নস্বরে বনচারী আরও কহিলেন, "মালদেবের দৈত্যলীলার অবসান হউক, দেখিবেন, সকল ভার দূরে ফেলিয়া চিতোর অচিরেই পাঠানের অস্ত্রের প্রতিঘাত করিতে বদ্ধপরিকর হইবে। প্রভু কি প্রবাহই দেখিয়াছেন, তাহাতে কি উত্তাপ নাই?"

হাম্মির সাবেগে কহিতে লাগিলেন, "শত শত অমূল্য জীবন যে অগ্নিতে নিজকে আহুতি দিয়াছে; রূপ, যৌবন, আশার ইন্ধনে যাহা পরিপুষ্ট হইয়াছে; গৃহে গৃহে যাহা পূজা ও সৎকার পাইয়াছে; এ যে সেই পুণ্যপ্রভ জহরাগ্নির লীলাস্থল। শত শত সহচরী ও অনুচরীপরিবৃতা পদ্মিনীর পবিত্র জ্যোতিতে যে অগ্নি অধিকতর জ্যোতিষ্মান হইয়াছিল, এখনও যে তাহার জীবন্ত নিদর্শন চিতোরের বক্ষ হইতে মুছিয়া যায় নাই। অগ্নি নিভিয়াছে, কিন্তু তাহার উত্তাপ মিবারবাসীদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া রহিয়াছে। অতীতের শৈত্য এখনও তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অপচয় ঘটাইতে পারে নাই।"

একটু থামিয়া আরও উত্তেজিতভাবে হামির আবার বলিতে লাগিলেন,—

"শুধু মিবার কেন, এ অগ্নি যে সমগ্র পৃথিবীগ্রাসী। শুধু রাজপুত কেন, এ অগ্নি যে মানব মাত্রেরই আরাধ্য। এ যে পবিত্রতার মহা যজ্ঞে জীবনের পূর্ণাহুতি! এ যজ্ঞে আকাঙ্ক্ষা নাই, জিগীষা নাই, ভোগেচ্ছা নাই! ইহা একান্ত নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্কাম! কাহার হৃদয়—শত্রু হউক, মিত্র হউক; স্বজাতীয় হউক, বিজাতীয় হউক; স্বধর্ম্মী হউক, বিধর্ম্মী হউক—কাহার হৃদয় রাজপুতাঙ্গনার এই অলৌকিক আত্মোৎসর্গে না গলিয়া থাকিতে পারে? মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন জহরের প্রদীপ্ত শিখা অতীতের অন্ধকারময় গহ্বর হইতে জ্বলিতে জ্বলিতে মানুষের অন্তর সন্তপ্ত করিবেই করিবে—।"

হামিরের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চতর হইতেছে দেখিয়া বনচারীর একটু আশঙ্কা জন্মিলেও, বাধা দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু সহসা একটা মৃদু মারুতহিল্লোল সে স্থানটা পুষ্পের সৌরভে একেবারে ভরিয়া দিল। স্নিগ্ধতার স্পর্শে বুঝি হামিরের উচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হইল। তিনি কিছুক্ষণ মৌনভাবে রহিলেন। গন্ধের আঘ্রাণে পুষ্পের বর্ত্তমানতা মনে আসিল। পুষ্পের স্মরণে সেই অশোকস্তবকের ব্যাপারও জাগিয়া উঠিল। তখন সেই স্তবকের সম্পর্কিত যাহা কিছু ঘটনা প্রবল স্রোতের মত আসিয়া প্রাণ মন ভরিয়া ফেলিল। স্বতঃই দক্ষিণ হস্তটা একবার উষ্ণীষে উঠিয়া সেই সযত্নে রক্ষিত পুষ্পদলগুলিকে অনুভব করিল। বনচারী প্রথমে তাহা ততটা লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু হামিরের হাত নামিবার কালে একটা

দল বাতাসে উড়িয়া বনচারীর বাহুতে পড়িল। জ্যোৎস্না এখনও পূর্ণরূপে না দেখা দিলেও, অন্ধকার বেশ একটু পাতলা হইয়া আসিয়াছিল। বনচারী সেই বায়ুনিক্ষিপ্ত দলটি অস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া একটু চমৎকৃত হইলেন।

ঊর্দ্ধে নীলাকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, নিম্নে লতায়, পাতায়, পল্লবে, শাখায় খদ্যোতকুল প্রস্ফুরিত হইতেছে। পূর্ব্বাশার অধরে যে সিত হাস্যটুকু দেখা দিয়াছে, তাহারই সংস্পর্শে প্রকৃতিও একটু হাস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। কুসুমের মৃদু সৌরভে, পবনের স্নিগ্ধ হিল্লোলে, অর্দ্ধালোকে, অর্দ্ধান্ধকারে সেই প্রশান্ত বনভূমি যেন স্বপ্নদৃষ্ট মায়ারাজ্যের আকার ধারণ করিয়াছে। হাম্বির তাহা মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—

"জলধর, ঋতুসংহার পড়িয়াছ ?"

জলধর দেখিলেন, আজ তাঁহার প্রভুর আলাপ ও আচরণ কিছু নূতন ধরণের। উষ্ণীষে ফুলের গুচ্ছ, প্রসঙ্গও কাব্য-রসাশ্রিত। জলধর উত্তর দিলেন,—

"এখন বড় মনে পড়ে না। রিপুসংহারের উত্তেজনার তলে বুঝি ঋতুসংহারের স্মৃতিটুকু ডুবিয়া গিয়াছে।"

হাম্বির আবেগসহকারে বলিতে লাগিলেন, "যাহা ভুলিয়াছ, তাহার অভিনব সংস্করণ একবার এক্ষণে প্রকৃতির মধ্যে দেখিয়া লও। গ্রন্থে যাহা বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে ন্যস্ত আছে, এখানে তাহা একীভূত হইয়া গিয়াছে। জগতের তিল তিল বিভিন্ন সৌন্দর্য্য লইয়া দেবতারা নাকি এক অনুপমা রূপসী গড়িয়াছিলেন। প্রকৃতি এখন বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন গুণ-সমষ্টির সমবায়ে যেন এক নূতন ঋতুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

এখানে শৈত্য আছে, মাধুর্য্য আছে, গাম্ভীর্য্য আছে। আলোকে, আঁধারে, গন্ধে, উচ্ছ্বাসে যেন এক নূতন জগৎ নামিয়া আসিয়াছে।"

জলধর এবার পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"যিনি নূতন চক্ষে দেখেন, তাঁহারই নিকট এ নূতন। অপরে ইহার নবীনত্ব কিছুই খুঁজিয়া পায় না। আপনি যে সমষ্টির কথা বলিলেন, তাহা বাহিরের ততটা নয় যতটা ভিতরের। অন্তরে যদি এই মাধুরীর সমবায় না ঘটে, তবে প্রকৃতি কি তাহা দেখাইতে পারে?"

হাম্বির। যাহাই হউক, ইহারও অস্তিত্ব আছে। ইহা কি নিভাজ কল্পনা?

জলধর। যতদিন না ভাঙ্গিয়া যায়, ততদিনই ইহা সত্য?

একটা দীর্ঘ শ্বাস যেন জলধরের হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া উঠিতেছিল। জলধর তাহা নিরোধপূর্ব্বক স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু, বোধ হয় প্রস্থানের সময় হইল?"

হাম্বির যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তর দিলেন, "আমি কোন বনাশ্রমে প্রসাদ পাইয়া আজ গুরুদেবের সকাশে রাত্রেই যাইব। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর।"

কিন্তু জলধর প্রথমে ইহাতে সম্মত হইলেন না। সঙ্গে যাইবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সহজে অন্যকে বিপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হাম্বিরের মত লোকের কাজ নয়, তিনিও জলধরের প্রস্তাব কিছুতেই অনুমোদন করিলেন না। প্রভুর সহিত বেশী বাক্যব্যয় করা ভাল দেখায় না, কাজেই জলধর হাম্বিরকে একাই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণাপঞ্চমীর চন্দ্র গগনমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বিশ্বের ভাণ্ডে এতক্ষণ যে মসী পোরা ছিল, সেটা ফেলিয়া এখন যেন তাহাতে পারদ ঢালিয়া দেওয়া হইল। প্রকৃতির কোণে ও কানায় একটু আধটু কালি লাগিয়া থাকিলেও পথ, ঘাট, বন মাজিয়া ধুইয়া একরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়ব লক্ষিত না হইলেও, মোটের উপর প্রকৃতির আকৃতি বেশ নয়নরোচক হইয়া দাঁড়াইল।

এই দৃশ্যের ভিতর দিয়া ছয় জন অশ্বারোহী তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাতাসে তাহাদের বেশভূষার শ্লথ অংশ সকল উড়িতেছে। পরিকরে আবদ্ধ তরবারি খাপের ভিতরেও মৃদু ঝন ঝন করিতেছে। অশ্বক্ষুরের কঠোর দ্রুত আঘাতে নিশার নিস্তব্ধ বক্ষ কাঁপিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এখন তাহারা সম্ভবতঃ গম্যস্থানের নিকটে আসিল, তাই গতিবেগের অনেক হ্রাস হইয়া পড়িল। এতক্ষণ যে ঘন নিশ্বাসের মাঝে কথাবার্ত্তা চাপা ছিল, তাহা এক্ষণে একটু মৃদু হইবার অবসর পাওয়ায় একজন অপরকে কহিল,—"বলি, লাগ্‌ছে কেমন সেখজী?"

সেখজী রসিক লোক। কহিল, "বেশ একটু মিঠেকড়া।"

প্রথম। এমন ভেজাল রকম কিসে?

দ্বিতীয়। মিঠে এই জ্যোৎস্নামাখান বাতাস টুকু, কড়া এই দৌড়ান আর হাঁপান।

তৃতীয় ব্যক্তি যোগ দিয়া বলিল, "সত্যি—এমন রাত্রে কি আর মারামারি ধরাধরি মানায়?"

চতুর্থ। কেন হে, কোমলের সঙ্গে কি একটু কড়া থাকা মন্দ?

চতুর্থ ব্যক্তি নূতন বিবাহ করিয়া কাজের খাতিরে প্রবাসে ছিল। তৃতীয় ব্যক্তি তাহাকে উত্তর দিল, "তুমি বুঝি তাই নরম প্রেমটাকে বিরহে কড়া করে তুল্‌তে এখানে এসেছ? ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি।"

পঞ্চম ব্যক্তি আর থাকিতে পারিল না। বলিয়া উঠিল, "রুচির কথা যদি বল্‌লে, তবে এখন নরম বিছানায় গরম স্বপনই ভাল লাগে। আমি হয়ত এতক্ষণ দেখতাম, ইন্দ্রের কোন অপ্সরা আমার কণ্ঠে বরমাল্য দিতে এসেছেন।"

পঞ্চম ব্যক্তির চল্লিশ পার হইলেও সঙ্গিনী মিলিয়া উঠে নাই। প্রথম ব্যক্তি সংসারী লোক। বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া কহিল, "যদি কেহ আসে, তবে সে রম্ভা। ভায়ার আমার বোধ হয় গরম স্বপন থেকে গরম চিতাতেই উঠতে হবে। আসল জাগাটা বুঝি আর এ জন্মে ঘটবে না।"

ষষ্ঠ একজন পাঠান-বংশধর। একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। নিজে যে একটা মহাবীর এইরূপ চালও খুব চালিত। সে এসব হাল্‌কা কথায় যোগ দিতেছিল না। বোধ হয়, মাথায় প্রকাণ্ড বিজ্ঞতার বোঝা থাকায় এগুলোর প্রবেশ করিবার পথও ততটা ছিল না। প্রথম ব্যক্তি পাঠান বীরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"উনি যে ভারি চুপচাপ। মনে মনে কেল্লা জয় কর্‌ছেন নাকি?"

পাঠান কহিল, "তোমাদের যেমন কাজে, কথায়ও তেমনি বাড়াবাড়ি। এই যে এক কথা সুরু করলে, ইহার আর বিরাম দেখতে পাই না।"

প্রথম ব্যক্তি রাজপুত। কহিল, "কি করি ভাই, ভগবান হাত দিয়াছেন, কাজ করি; মুখ দিয়াছেন, কথা কই। বেদে কেন কোরাণেও ইহাতে কোন পাপ লেখে না।"

পাঠান। তা বলে এতটুকু বিষয়ে এতখানি কথা, এতটুকু কাজে এতখানি সোরগোলে কি ফয়দা?

প্রথম। কথার সম্পর্কে না হয় একটু দোষ ধরে লওয়া গেল। কিন্তু কাজে আবার হলো কি?

পাঠান বুক ফুলাইয়া বলিল, "কেন, একটা শিয়াল ধরতে এতগুলোকে টেনে না আনলে কি হতো না?"

প্রথম। ওঃ, এই তোমার দুঃখ। তা তখন না হয় আমরা দু'টো ছড়া কাটবো, তুমি একাই ধরে বাহবাটা লইও।

তৃতীয় ব্যক্তি একটু ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "সেই দিনের মত না কি? তা হলে তো বাছার সেইরূপ কাদামাথাই সার হবে।"

অন্য একদিন এইরূপ কাজে পাঠান পিঠটান দিতে গিয়া কাদায় লুটাপুটি খাইয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। সুতরাং সে সেই ঘটনার উল্লেখ করায় পাঠান ভারি চটিয়া গেল। কি যে বলিবে তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শেষে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি, ঠাট্টার আর জায়গা পাও না? জান না, তখন বর্ষাকাল?"

তৃতীয় ব্যক্তি বাধা দিয়া বলিল, "হা ভাই, ভুল হয়েছে বটে, তবে কি না এখনো তো ধুলায় পা আটকাতে পারে। তা তোমার যেমন পা পিছলায়, আমার জিবটা না হয় একটু সেইরূপ পিছ্‌লে কথাটা বলে ফেলেছে। এতে কি আর এত চট্‌লে ভাল দেখায়?"

প্রথম ব্যক্তিই দলপতির কাজ করিতেছিল। বলিল, "এই তো সেই পথের ত্রিবেণীতে আসা গেল। ঐ দুই দিকের যে দিক দিয়াই আসুক এখান দিয়ে যেতেই হবে। খুব সম্ভব ঐ তড়াগের জলে ও তীরের ঘাসে অশ্বারোহী অশ্বটিকে একটু তাজাও করতে পারে। সন্ধ্যার ছায়া পড়্‌লেও, তখনই তাহার ঘোড়াটিকে যেন কিছু পরিশ্রান্ত দেখেছি। আমরা কিন্তু আর ওদিকে যাব না। ঐ বনের মধ্যেই একটু গা-ঢাকাভাবে থাকা যাক।"

পঞ্চম ব্যক্তি একটু চমকিত হইয়া বলিল, "দূরে একটা কি শব্দ শোনা যেতেছে না?"

সকলেই কান পাতিয়া শুনিল। প্রথম ব্যক্তি কহিল, "ঠিক বটে, বোধ হয় তোমার বিয়ের ঘটকই আস্‌ছে।"

এই দলপতি আর কেহ নয়, এ সেই হরিসিংহের অনুচর। সরাইতেও ইহার একবার দেখা পাওয়া গিয়াছিল। সে এইবার তাহার দল লইয়া যথাস্থানে ঘাটি পাতিয়া বসিল। ক্রমে দূরের শব্দ নিকটে আসিল। ক্রমে একজন অশ্বারোহী নয়নপথে পড়িল। অনুচর চিনিল, এই সেই অজেয়প্রতাপ হামির। হামিরের অশ্ব বাস্তবিক সেদিন খুবই খাটিয়াছিল। দলপতি যাহা আশা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। হামির সেই

স্থানে পৌছিয়া প্রিয় বাহনটিকে দুর্ব্বাদলে ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজে তড়াগের ধারে বসিয়া বারি-সংস্পর্শ-শীতল বায়ুর ব্যজনে বড় সুখানুভব করিলেন। কিন্তু অশ্বটি আহারে তেমন যেন মন দিল না। মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হইয়া ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। দলপতি হামিরের নিদ্রাকর্ষণেরও অপেক্ষা করিত, কিন্তু অশ্বের ঐরূপ অস্থিরতায় পাছে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় শীঘ্রই সদলে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে কোষ হইতে কৃপাণ বীরের বজ্র-মুষ্টির আশ্রয়ে চন্দ্রকিরণে ঝকমক করিয়া উঠিল। যে খুব গায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে সেই অকৃতদার প্রৌঢ়। বোধ হয় মনে করিয়াছিল, অস্ত্রখানা সহসা হাত হইতে কাড়িয়া বাহাদুরী দেখাইতে পারিলে, একটা বড় গোছ শিরোপা মিলিবে। এবং তাহাতে একটা অপ্সরা যোটাইবারও বেশ সুবিধা হইবে। কিন্তু হঠাৎ তাহার মাথাটা দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ায়, বন্ধুর অভিশাপটাই ফলিয়া গেল। তার পর প্রবাসীর নব-পরিনীতা ভার্য্যা বিধবা হইলেন। পাঠান বীর দুইটা প্রাণ-পাখীকে উড়িতে দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে নিজের অশ্বের দিকে ছুটিল। দলপতি দেখিল, অপর দুই জন এখনও দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবল অসির মুখে পদমাত্র অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য! সে তখন একটু দূরে সরিয়া গেল। পূর্ব্বে সেখানে একটা ধনু ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এখন তুলিয়া শর যোজনা করিল। কিন্তু যেমন ছুড়িতে যাইবে, অকস্মাৎ বনের মধ্য হইতে একটা বর্শা আসিয়া তাহার দক্ষিণ বাহুতে বিঁধিল।

তীর খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সে দেখিল বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একজন অস্ত্রধারী তাহাদের দিকে ক্ষিপ্রগতিতে আসিতেছে। অবশিষ্ট আক্রমণকারীরা এবার ক্ষতের রক্তে চারিদিক রঞ্জিত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন দিল। হাম্বির কিংবা নবাগত অস্ত্রধারী তাহাদের আর অনুসরণ করিলেন না।

পাঠানবীর যাহাই বলুক, যাঁহার বিরুদ্ধে গুপ্তচরদিগকে পাঠান হইয়াছিল তাঁহার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা বড়ই কম বলিতে হইবে। হরিসিংহ ইহা যে বুঝেন নাই তাহা নহে। তাঁহার মতলব ছলে কিংবা কৌশলে যদি সিংহকে ধরা কিংবা মারা যায়। সম্মুখ যুদ্ধে যে অশ্বারোহী হাম্বিরকে বহু লোকেও কায়দা করিতে পারিবে না, তাহা তিনি জানিতেন। দলপতিও প্রথমে কৌশলেই কাজ সারিতে চেষ্টা করিয়াছিল, শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই বনচারী জলধরই এই নবাগত অস্ত্রধারী। তাঁহারও অশ্ব সেই বনের মধ্যে বাঁধা ছিল। হাম্বির যখন তাঁহাকে নির্ব্বন্ধসহকারে বিদায় দিলেন, তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি গৃহের দিকেই ফিরিতেছিলেন। কিন্তু পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতে নূতন ঘটনা-স্রোত তাঁহাকে অন্যদিকে টানিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্বে যে সরাইয়ের কথা বলা হইয়াছে, জলধর যখন তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন, সেই সময় দূর হইতে

একাধিক অশ্বের পদধ্বনি তাঁহার শ্রুতিমূলে পৌঁছিল। এমন রাত্রিকালে এরূপ দলবদ্ধ হইয়া কাহারা যাইতেছে, জানিবার জন্য তিনি একটু অন্তরালে থাকিয়া অপেক্ষা করিলেন। হাম্মিরের অন্বেষণে হরিসিংহের প্রেরিত যে চরগণ পান্থশালায় গিয়াছিল, জলধর গৃহে ফিরিবার কালে তাহাদিগকেই দেখিতে পাইলেন। অন্তরাল হইতেই তিনি তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন এবং যদিও তাহাদের কথাবার্ত্তা স্পষ্ট তত শুনিতে পাইলেন না, তথাপি যে দুই একটি শব্দ তাঁহার কানে গেল, তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল সন্দেহের উদ্রেক হইল। জলধর অশ্ব সেই স্থানে রাখিয়া, তাহাদের অলক্ষ্যে পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা সরাইয়ে প্রবেশ করিলে, জলধর তৎপার্শ্বস্থ কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া রহিলেন। আবার যখন তাহারা সরাই ত্যাগ করিয়া পুরীর বহির্ভাগে চলিয়া গেল, তিনিও নিজের অশ্বে আরূঢ় হইয়া গুপ্তভাবে তাহাদের অনুবর্ত্তন করিলেন। পরে তাহারা যখন অশ্ব হইতে নামিয়া হাম্মিরকে ঘিরিয়া ফেলিল, তখন জলধরও যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষান্তরাল হইতেই উদ্যত-ধনু দলপতির প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলেন।

হাম্মির এখন নগর অপেক্ষা নিজের বিরাম স্থানের কাছেই আসিয়াছিলেন। এবার তিনি সমস্ত অবগত হইয়া জলধরকে নিজেই সঙ্গে করিয়া লইলেন। তাঁহারা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পার্ব্বত্য ভূমির উপর দিয়া চলিলেন। ক্রমে পথ খুব বন্ধুর ও বক্র হইয়া আসিল।

কোথাও বৃক্ষশ্রেণীর অবকাশে ক্রমোন্নত পথে জ্যোৎস্না

আসিয়া পড়ায় তাহা একটা শ্বেতবর্ণ নিম্নগামী স্রোতের মত দেখাইতেছে। কখন বা একটা দূরস্থ চারণভূমি অতি শুভ্র সূক্ষ্ম মেঘে ঢাকা গগনখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ক্রমোন্নত অরণ্যের উপর স্থানে স্থানে খদ্যোতের বিকাশে মনে হইতেছে, যেন প্রকৃতি-দেবী একখানা চুমকি-বসান সাদা কাপড় পরিয়া আনতদেহে দাঁড়াইয়া আছেন। অরণ্যের মধ্য হইতে যে অবিরাম ঝিল্লীগান উঠিতেছে, কচিৎ দুই একটা বন্য জন্তুর আস্ফালনে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কোথাও বা নির্ঝরিণীর একঘেয়ে সুরে, কখন দুই একটা শিথিল প্রস্তর-খণ্ডের অথবা দুই একটা পক্ক ফলের পতনে একটু বৈচিত্র্য আনিয়া দিতেছে। ক্রমে দুই একটা বাসগৃহ দেখিতে পাওয়া গেল। হাম্মির কোন আঘাত পান নাই বটে, কিন্তু হত ব্যক্তিদিগের শোণিত তাঁহার পরিধেয়ে লাগিয়াছিল। তাহা পরিবর্ত্তন করিতে ও অশ্ব দুইটিকে রাখিতে হাম্মির একজন গৃহস্বামীকে ডাকিলেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে জলধর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইবামাত্র পথের একটু অন্তরে একটা বৃক্ষতল হইতে কে যেন বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

জলধর উত্তর দিলেন "আমি জলধর।"

ইহার পর আর কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না। কিন্তু বৃক্ষের অভিমুখে দুই এক পদ ফেলিবামাত্র একটি বালিকা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া জলধরের সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘুমের ঘোরে যে দুই একটা পাপিয়া বনের মাঝে কখন কখন ডাকিতেছিল তাহারই মত মিষ্ট সুরে কহিল,—

"আর আমি চপলা।"

চপলা প্রকৃতিতে বালিকা হইলেও বয়সে তত নহে। বাস্তবিক সে ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির মুক্ততার মাঝে বর্দ্ধিত উদ্দাম-স্বভাব সে আজও ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই এখনও সে কি দিবসে, কি নিশায়, স্বচ্ছন্দে তাহাদের আবাসস্থানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। জ্যোৎস্না-রাত্রি পাইলে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। এখনও রজনী শেষ হইতে বিলম্ব থাকিলেও, আজও সে চন্দ্রালোকে তখনই ফুল তুলিতে বাহির হইয়াছিল। চপলা নিজেকে বালিকাই ভাবুক আর যুবতীই ভাবুক কিন্তু যখন সে তাহার পূর্ণ, দীর্ঘ, সঙ্কোচমাত্রহীন দেহযষ্টি উন্নত করিয়া সুধাংশুকিরণস্নাত হইয়া দণ্ডায়মানা হইল, তখন মুগ্ধ জলধরের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

জলধর দেখিলেন যেন মায়াবলে জ্যোৎস্নারাশি জমাট বাঁধিয়া সহসা তাঁহার সম্মুখে রমণী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন খানিকটা খুব কাল মিশমিশে মেঘ তাহার পার্শ্বে বাতাসে কেশের মত দুলিতেছে। বিদ্যুতের তীক্ষ্ণতা ফেলিয়া শুধু ঔজ্জ্বল্য লইয়া যেন সে প্রতিমার নয়ন গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই চাঞ্চল্যে ঈষৎ স্ফারিত সুগঠিত নাসিকা, সেই চন্দ্রকলার নিম্নে দুইটি কাল রেখার মত—যাহা খুব ক্ষীণও নহে খুব প্রসরও নহে এবং যথাসম্ভব বক্র ও দীর্ঘ—এমন ভ্রূযুগ, সেই মৃদু হাস্যে ঈষৎ বিভক্ত সূক্ষ্ম অথচ পরিপুষ্ট অধরোষ্ঠ, সেই তেজস্বিনী অথচ কোমলস্পর্শা লতার মত দুইখানি ক্রীড়াচপল হস্ত যাহা চম্পকতুল্য অঙ্গুলিতে চম্পক লইয়া খেলা করিতেছিল;—সংক্ষেপতঃ সেই সুকুমার সুকোমল দেহযষ্টির যেখানেই সেই

মায়াবিষ্ট দর্শকের নয়নপাত হইল, তাহাই যেন অনৈসর্গিক মন্ত্রসৃষ্ট বলিয়া মনে লাগিল। জলধরকে মৌনী দেখিয়া বালিকা সহাস্যে বলিল, "জলধর, দুইদিন না দেখিয়াই আর চিনিতে পারিলে না ?"

নীরব প্রতিমা এবার মানুষের কণ্ঠে কথা বলায় জলধরের বিভ্রম একটু কাটিল। বলিলেন, "কেমন করিয়া চিনিব ? তুমি যে নিত্য নূতনরূপে দেখা দাও, চপলা !"

চপলা। কেন ? আমার দেহটা কি ইহারই মধ্যে দ্বিগুণ না ত্রিগুণ হইয়া গিয়াছে ! আকাশের চপলার মত শুধু আমার পরিবর্ত্তনটাই দ্রুতগামী নাকি ? তাহা হইলে আমার নাম চপলা না রাখিয়া এই পরিবর্ত্তনটাকে চপলা নাম দিলে ভাল হয়। আমি জানি, আমি ছুটিতে পারি বলিয়াই আমি চপলা।

জলধর। শুধু ছুটিতে পার বলিয়া ত নয়—পড়িতেও পার বলিয়া।

চপলা। তা তো ছুটিতে গেলেই, পড়িতেও হয়। যে চুপটি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, সে কি আর পড়ে ?

জলধর দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন, "চপলা, সেইরূপ থাকাই ভাল ছিল। তা হইলে তুমি ছুটিতেও না আর পড়িতেও না।"

চপলা। না ছুটিয়াও তো পড়া যায়।

পরে হস্তস্থিত চম্পকগুলির মধ্য হইতে কয়েকটা বাছিয়া বলিল, "কেন, এগুলির তো পা নাই, কিন্তু ইহারা তো দিব্য তলায় পড়িয়াছিল।"

"যাহাদের চৈতন্য নাই, তাহারা জানে, তাহারা পড়িয়াছে, তাই বুঝি ভাবনায় শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহার চৈতন্য আছে, সে পড়িয়াছে কি না জানে না, তাই চিন্তার লেশমাত্রও তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু এ না জানাই তো ভাল। মূঢ় আমি, কেন জানাইতে চাহি!"

ফুলগুলিকে লক্ষ্য করিয়া জলধর মনে মনে বলিতে যাইয়াও অনেক শব্দ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারিত করিয়া ফেলিলেন। চপলা তাহা কতক শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "ও, তুমি আমাকে বাজপাখী মনে করিয়াছ। সে যেমন আগে শিকারের সন্ধান জানে, তারপর পড়ে।"

জলধরের সুবুদ্ধি তাহাকে থামিতে বলিল। কিন্তু জলধর ভাবিল আরো একটু বলিলে ক্ষতি কি, ওতো কিছুই বুঝে না। জলধর নিরাশার মাঝেও একটু হাসিয়া বলিল, "পাখীটা বাদ দিলেও চলে। তাহা হইলে তোমার সঙ্গে খাটেও বেশ।"

চপলা একটু ভাবিয়া উত্তর দিল "কি? শুধু বাজ? ঠিক ঠিক, আকাশে থাকিলেই চপলা—পড়িলেই বাজ। তা আমি পড়িলাম কোথায়?"

জলধর। মেঘের চপলা মাটিতে আসে। তুমি মাটির চপলা, তোমার গতি ঠিক উল্টা।

চপলা হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমি কি তবে মেঘে গিয়া পড়িলাম? না, না, তবে তো জল হইয়া যাইতাম। আর ইন্দ্রের হাতীগুলো আমাকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিত।"

জলধর এখনও বুঝিলেন না। যদি মনের কথা বলিয়া

লাভ নাই, তবে তাহার উল্লেখ কেন? কিন্তু একজন তৃষ্ণাতুর যেমন সমুদ্রকূলে বসিয়া নিষিদ্ধ লবণাক্ত জল স্পর্শ করিবে না স্থির করিয়াও ঢল ঢল নীলাম্বুর পানে সতৃষ্ণলোচনে না তাকাইয়া থাকিতে পারে না, জলধরেরও সেই দশা হইল। জলধর জানিতেন যে, তাহাদের সেরূপ আলাপে কোন ফল নাই, তথাপি তাহা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। যেন নেশার মত তাঁহাকে তাহা ঘেরিয়া ধরিয়াছিল। জলধর বলিলেন, "কেন জলধর"—কথাটা একটু যেন সারিয়া আবার বলিলেন, "কেন মেঘ কি তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না? না, না, পারে না বটে, তুমি যে উত্তাপহীন।"

চপলা এবার হঠাৎ জলধরের হাতের উপর হাত রাখিল। কোমল দৃষ্টিটা ঠিক তাঁহার মুখের দিকে ফিরাইয়া কহিল, "কই, দেখ দেখি, তোমার চেয়ে আমার হাত কি ঠাণ্ডা?"

চপলার সেই দৃষ্টিতে জলধরের মনে তাহাদের প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্য জাগিয়া উঠিল। সেদিনকার দৃষ্টির সঙ্গে এই দৃষ্টির যেন বড় সাদৃশ্য আছে। নবীন শিষ্য গুরুগৃহে যাইতে দেখিল, এক অনুপমা কিশোরীর অঞ্চলে একটা গুল্মের কাঁটা চারিদিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে যেন একা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছে না। কি এক কোমল ভিক্ষাপূর্ণ কটাক্ষে সে পথিকের দিকে চাহিল। কণ্টকাবৃত গোলাপ যেন বলিল, "আমাকে এ কাঁটাগাছ হইতে তুলিয়া লও।" কিন্তু চপলার সে দৃষ্টি শেষে অশনি হইয়া জলধরের বক্ষে পড়িল।

এক্ষণে চপলার সেই স্পর্শে মুগ্ধ জলধর নিজেকে একেবারে ভুলিলেন। বিশাল জগৎখানা তাঁহার সমুখ হইতে কোথায়

উড়িয়া গেল! জলধরের চক্ষে আর এখন কেহ নাই, কিছুই নাই। দেশ নাই, সমাজ নাই, অধীনতা নাই, বন্ধন নাই। আছে শুধু তাঁহার এক মুক্ত সর্ব্বগ্রাসী প্রেম। জলধর মন্ত্রমুগ্ধবৎ চপলার অংশোপরি বাম হস্ত স্থাপন করিলেন। রসনা যেন কাতরস্বরে হৃদয়ের ব্যথা জানাইতে যাইতেছিল, কিন্তু তখনই তাঁহার হাতে চপলার কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালা ঠেকিল। একি? তাহা কি চপলার সংস্পর্শে বিদ্যুতে ভরিয়া গিয়াছে?

সেই অক্ষমালার অনুভবমাত্রেই জলধর সত্যই বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ হাত উঠাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। নিদারুণ সত্য তড়িদ্বিকাশের মত হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। মোহান্ধ জলধর এতক্ষণে যেন চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের মিলন যে একান্ত অসম্ভব। কোনকালে, কোনস্থানে তাহা সাধিত হইবে না। চপলা সন্ন্যাসী কন্যা—ব্রাহ্মণ কন্যা, জলধর রাজপুত। চপলা সেদিন যে তাহার পিতার ঐ একছড়া অক্ষমালা পরিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতেই সমস্ত ব্যাপার লুব্ধচিত্ত জলধরের সমুখে যথাসময়ে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তীব্র অনুশোচনায় রাজপুত দগ্ধীভূত হইলেন। যে অসংযত করে চপলার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিলেন, সমস্ত ক্রোধ যেন তাহার উপর আসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ কোটি হইতে ছুরিকা লইয়া যেন তাহার শাস্তি বিধানার্থ সেই হাত লক্ষ্য করিয়া তাহা সজোরে নামাইলেন। কিন্তু ছুরিকা সম্পূর্ণ নামিবার পূর্ব্বেই চপলা ঝুঁকিয়া জলধরের বাহু ধরিয়া ফেলিল। তাহাতে ক্ষত তত গভীর হইল না বটে, কিন্তু তবুও চপলার কেশের যে একটা গুচ্ছ এই গোলযোগে জলধরের হাতে আসিয়া

পড়িয়াছিল—সেও যেন বাধা দিতেছিল—তাহা ভেদ করিয়া ছুরিখানা লক্ষ্যস্থলে একটু বসিয়া গেল। কেশ সরাইয়া চপলা দেখিল, তাহা হইতে দর দর ধারে রক্ত পড়িতেছে। চপলা কহিল, "উন্মত্ত, এ কি করিলে!"

চপলার স্বর এবার আর তো চপলা বালিকার মত নয়! তাহা যেন রুদ্ধ আবেগে কাঁপিতেছে। চপলা তখনই দুই একটা পাতা তুলিয়া করতলে মর্দ্দিত করিল এবং তাহা ক্ষত স্থানে বসাইয়া নিজের অঞ্চল হইতে কাপড় ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিল। জলধর এখন নির্ব্বাক, শান্ত,—যেন সমাধিগ্রস্ত। আর মোহও নাই, অনুতাপও নাই। চপলাও নীরবে আনত-নয়নে জলধরের হাতে কাপড় জড়াইতেছে। কাপড় রক্তে সিক্ত হইয়া উঠিতেছে, না শুধু তাহাতো নহে, উপর হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজলও তাহাকে ভিজাইয়া দিল। জলধর তাহা লক্ষ্য করিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ফিরিয়া জলধর দেখিলেন, দূরে এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী। নির্ভীক বীরের হৃদয় এবার কাঁপিয়া উঠিল। সত্যই কি গুরুদেব সব দেখিয়াছেন! সন্ন্যাসী ডাকিলেন,—

"চপলা!"

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জলধরের হাত একটু সরিয়া যাওয়ায় যে বাঁধনটুক বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, চপলা তাহা ঠিক করিতে করিতেই

বলিল, "যাই বাবা, জলধরের হাতে আঘাত লাগিয়াছে, তাই ঔষধ বাঁধিয়া দিতেছি।"

বাঁধা শেষ হইলে, জলধর গিয়া গুরুপদে প্রণাম করিলেন। গুরু আশীর্ব্বাদ করিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "বৎস, যে হস্ত চিতোরের পাশ মুক্ত করিবে, তাহাকে অযত্ন করিও না।"

এই সময়ে হাম্বিরও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জলধর দৃঢ়স্বরে যুক্তকরে উভয়কেই বলিলেন, "আপনাদের কাছে দাসের একটি নিবেদন আছে। শুনিবেন কি?"

গুরুদেবকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া হাম্বিরই অগ্রে উত্তর দিলেন, "জলধর, তুমি যে শত ঋণে আমাকে বাঁধিয়াছ। তোমার এমন কি কথা আছে, যাহা আমি শুনিব না?"

জলধর। মহারাণা, এ ছদ্মবেশী জীবন আর বহিতে পারি না।

চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় না থাকিলেও, হাম্বিরকে তাঁহার প্রজারা মহারাণা বলিয়াই সম্বোধন করিত। আর প্রচ্ছন্নতার প্রয়োজন নাই, তাই এক্ষণে জলধর হাম্বিরকে মুক্তভাবেই সম্ভাষণ করিলেন। হাম্বির কহিলেন, "ও বেশ তো শীঘ্রই খসিয়া যাইবে। ইহাতে আর চিন্তা কেন?"

জলধর। ক্ষমা করিবেন প্রভু, আমার যেন ইহা অসহ্য হইয়াছে। সিংহের প্রজা হইয়া শৃগালের রাজ্যে আর কত দিন বাস করিব?

এবার গুরুদেব কহিলেন, "জলধর, শুধু তোমার কেন, এরূপ আক্ষেপ কি আমাদের অনেকেরই নয়? সমুখেই দেখিতেছ, মহারাণা স্বয়ংই যে আজ নিজের বেশে, নিজের স্থলে অধিষ্ঠিত নহেন। আর—"

একটু হাসিয়া নিজেকে লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "আর এই সন্ন্যাসীর সাজের নীচেও যে কপটতা থাকিতে পারে না, তাহারই বা ঠিক কি। ঘটনাচক্রে অনেককেই এখন কোন না কোন প্রকারে একটু ছদ্মবেশী হইতে হইয়াছে।"

জলধর তথাপি নিজের জেদ বজায় রাখিয়া কহিলেন, "চরের বেশ ঘুচাইয়া এ দাসকে প্রভুর অনুচরের বেশে সাজাইলে কি চলে না?"

সন্ন্যাসী। কিন্তু তোমার কাজ তো সোজা নয়। তাহা কাহার উপর অর্পণ করিবে?

জলধর ভাবিতেছিলেন, এইরূপ চরের কাজ করিতে গেলেই তো নিয়তই সন্ন্যাসীর গৃহে আসিতে হইবে। এই তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রণাস্থান। আবার তো নিয়তই সেই মুখ নয়নে পড়িবে। আশঙ্কায় জলধরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কে জানে, সেই দৃষ্টি আবার যদি সেইরূপ মায়া রচনা করে। তাঁহার কার্য্য যে অন্যের দ্বারা চলিতে পারে, ইহাও জলধর জানিতেন। চিতোর ছাড়িয়া প্রকাশ্যে হাম্বিরের দলে আসিলে, জলধরের সহসা বিশেষ ক্ষতি হইবে, এই ভাবিয়াই যে হাম্বির স্নেহবশতঃ তাঁহাকে এ অবধি সেরূপ করিতে দেন নাই, ইহাও তিনি বুঝিতেন। সন্ন্যাসীর প্রশ্নোত্তরে জলধর এবার যেন কিছু উত্যক্ত হইয়া বলিলেন, "লুকোচুরির কি এখনো প্রয়োজন আছে? মুক্ত-কৃপাণে চিতোর লইবার সময় কি এখনও আসে নাই?"

হাম্বির জলধরের এরূপ উদ্দামভাব কখনও দেখেন নাই, তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। সন্ন্যাসী নীরব রহিলেন বটে,

কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল না। জলধর হাম্মিরের সে বিস্ময়ের অর্থ বুঝিলেন। জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "প্রভু, দাসের অনেক দোষ ক্ষমা করিয়াছেন, এবারে এ আবদারটুকুও সহিতে হইবে। মন্ত্রণার কাজ হইতে আমাকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিন। আমার অপেক্ষা অনেক নিপুণ চর আপনি পাইবেন।"

হাম্মির জলধরকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জলধর, ঠিক করিয়া বল, তোমার কি এমন কোন শত্রু আছে, যাহার উপর দেশ-লুণ্ঠনের সুযোগে তুমি প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা কর?"

জলধর মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "না প্রভু, সত্য বলিতেছি, আমার সেরূপ কোন শত্রু নাই। আমি নিজেই আমার শত্রু।"

সন্ন্যাসী এবার জলধরের হাত ধরিলেন। কহিলেন, "বল, এ শত্রুকে বিনাশ করিবে না।"

জলধর কথাটা পরিষ্কার বুঝিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ শত্রু?"

সন্ন্যাসী। এই যে বলিলে, তুমি তোমার শত্রু। বল, তুমি তোমাকে বিনাশ করিবে না।

জলধরের এবার ঠিক ধারণা হইল,—সন্ন্যাসী তবে সকলই বুঝিয়াছেন। জলধর মরমে মরিয়া গেলেন। মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "জলধর, সম্মুখে বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র—কত বিরোধ, কত বিপদ, কত প্রলোভন। আবার কত আশা,

কত সম্পদ, কত জয়। এ সকল অবস্থার ভিতরে নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া মনে রাখিও, এ জীবন চিতোরের উদ্ধার-কার্য্যেই উৎসর্গ করা হইয়াছে। যদি সেই মহা অনুষ্ঠানে জীবন যায়, কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু বল, কখন আত্মবিনাশ করিবে না। বল, কখন মৃত্যুর জন্য, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইবে না। জানিও, তাহা হইলে দেবতার উদ্দেশে দান আবার নিজের হাতে লওয়া হইবে। ইহা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কি আছে!"

জলধর দেখিলেন, সন্ন্যাসী তাঁহার অন্তরের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছেন। তিনি তো এইরূপেই জীবনটাকে শেষ করিতে চাহিতেছিলেন। অমানিশার অন্ধকারের মত তাঁহার নিজের দুঃখ আর এক সন্দেহের মেঘে যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। ছুরির ক্ষতের উপর চপলার সেই অশ্রু যেন তাঁহার হাতে এখনও বিঁধিয়া রহিয়াছে। সত্যই কি সেই বালিকাও তাঁহার প্রতি অনুরক্তা? তাহা হইলে তো তাঁহার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন পথ নাই। যদি কোন মোহের মুহূর্ত্তে তাহারা দুই জনেই প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসিয়া যায়! এদিকে সন্ন্যাসীর সেই উপদেশও জলধরের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। এই দুই বিপরীত উদ্দেশ্যের সংঘর্ষে সহসা তাঁহার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, "জলধর, তুমি রাজপুত, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে?"

একটু রহস্যময় ভাষায় পুনরায় বলিলেন, "যাহা বলিয়াছি, তাহাতে স্বীকার কর। কোন আশঙ্কা নাই। ঐ ব্রতের

শেষে তোমাকে এমন মন্ত্র দিব, যাহাতে সব ক্ষোভ দূরীভূত হইবে।"

মন্ত্রের আশায় নহে, কারণ জলধর জানিতেন, এমন কোন মন্ত্র নাই, যাহা তাঁহার ছিন্ন হৃদয়কে যোড়া দিতে পারে, উহা সন্ন্যাসীর একটা প্রবোধবাক্য মাত্র; কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকারী তিনি যে নিজে নহেন, তাহা যে চিতোরলক্ষ্মীর অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, এই ভাবিয়াই জলধর আর গুরুর কথা ঠেলিলেন না। সন্ন্যাসীর চরণস্পর্শ করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব, তাহাই হইবে।"

গুরুদেব বলিলেন, "দেখিও, রাজপুত কখনও সত্য ভঙ্গ করে না।"

হাম্মির সবিশেষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। আবার জলধর আপনা হইতে যখন কিছু ভাঙ্গিলেন না, তখন সে বিষয়ে আর বেশী আন্দোলনও অসঙ্গত। হাম্মির কেবল এইমাত্র বুঝিলেন যে, কোন এক দারুণ বেদনা জলধরের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছে। তবুও সময়ে যদি তাহার কিছু প্রশমন হয়, এই ভাবিয়া হাম্মির সস্নেহে বলিলেন, "জলধর, সপ্তাহ পরে আসিও। তোমার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ কার্য্যেরই ভার লইও। এখন চল, একটু বিশ্রাম করিবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যুষে গণেশপ্রসাদ গৃহের দিকে চলিয়াছেন। অরুণের রথের চূড়াটা দেখা দিয়াছে মাত্র। ভাঙ্গা চাঁদখানা আকাশে মিটমিট করিতেছে এবং তাহার আলোকে দ্রব্যজাতের ছায়া এখনও পূর্ব্বাভিমুখী রহিয়াছে। তবে সে ছায়ায় বিকাশোন্মুখ প্রভাতের শুভ্রতা পড়ায়, তাহা ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছে। পাখী জাগিয়া গান শুনাইবার জন্য সুর ভাঁজিতেছে, ফুল ফুটিয়া রূপ দেখাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ঊষা উঠিয়া জগৎমঞ্চে অভিনয়ের জন্য যে একটু সাজিতেছিল, তাহার সে সাজকরা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। পবনের দেহ একটু সিক্ত থাকিলেও, তাহা যেমন শুকাইতেছে, তাহাতে আর নূতন শিশির বড় পড়িতেছে না। নিদ্রিত পথ ঘাট ক্রমে দুই এক জন পথিকের পদশব্দে জাগিয়া উঠিতেছে। ওস্তাদজী যাইতে যাইতে ভাবিতেছেন, কোন্ রাগিনীটা একটু ভ্রমরকণ্ঠে আলাপ করা যায়। কিন্তু ভাবনা হইতে তাঁহাকে আর কাজে নামিতে হইল না, সহসা পশ্চাদ্দিকে কতকগুলা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠিল। গত রাত্রির ঘটনায় তিনি কিছু সন্দিগ্ধ ছিলেন। অলক্ষ্যে থাকিয়া ব্যাপারখানা কি দেখিবার আশায় একটু পাশ কাটিয়া দাঁড়াইলেন। অনতিবিলম্বেই চারিজন অশ্বারোহী পথ দিয়া চলিয়া গেল। গণেশপ্রসাদ চিনিলেন, ইহারাই সেই মধ্যরাত্রে পান্থশালায় দৃষ্ট অতিথিদলের একাংশ।

অশ্বারোহীরা মন্থরগতিতেই যাইতেছিল, গণেশপ্রসাদ অন্তরালে থাকিয়াই কিয়ৎক্ষণ তাহাদের অনুবর্ত্তন করিতে পারিলেন।

আহত দলপতিকে মধ্যে রাখিয়া তাহার দুইজন সঙ্গী দুইপাশে যাইতেছিল, যেন কোন প্রয়োজন হইলে, তাহারা তখনই সাহায্য করিবে। তৃতীয় ব্যক্তি সেই পাঠান বীর। সে সকলের পশ্চাতে ছিল। দলপতির পার্শ্বস্থ একজন অশ্বারোহী তাহাকে বলিল, "কি হে, এতক্ষণ আগে আগে আসছিলে, এখন পেছুলে কেন?"

সে কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অপর পাশের লোকটা কহিল, "এখন ফর্সা হয়েছে, বর্ষার ভয় তো নাই।"

প্রথম। ভর্ষাই বা কি। দিনেই কি তাহারা ডরায়?

পাঠান প্রথমে কিছু কথা কহিল না। একবার মাথাটা ঘুরাইয়া, কোন গুপ্ত বর্ষাফলক তাহার দিকে উদ্যত হইয়াছে কি না, তাহাই বুঝি ত্রস্তভাবে দেখিয়া লইল। কিন্তু কাজটা গোপনে সারিতে গিয়াও সঙ্গীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া গেল। অমনি একটা হাস্যের রোল সঙ্গীদের দাড়ীগুলা ও তৎসঙ্গে পাঠানের অন্তরটাও নাড়িয়া দিল। ইহাতে দাড়ীগুলা শীঘ্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল বটে, কিন্তু অন্তরটা সেই নাড়ায় ঘাটুকু খাইয়া বেশ একটু কাঁপিতে লাগিল। পাঠান হৃদয়ের সে স্পন্দনটুকু ঢাকিয়া বলিল, "আঃ, ঘোড়াটা ভারি নেতিয়ে পড়েছে।"

প্রথম। তা এত ছোটালে আর পড়্‌বে না?

দ্বিতীয়। বাপ্‌রে, সে কি দৌড়! এত হাঁকাহাঁকি ত কি প্রবোধ মানে।

পাঠান। সত্য সত্যই ঘোড়াটা ভারি ভীতু।

প্রথম। হোক, পুষিয়ে গেছে, সওয়ার তো খুব সাহসী? তা না থামলেই হতো। একেবারে রাজপুত্রের কাছে গৌরবের মুকুট পরে বসে থাকৃতে, আমরা গিয়া দেখে চক্ষু জুড়াতাম।

দ্বিতীয়। তবে কিনা এখন মাথায় মুকুট নেবেন, না আস্ত মাথাটাই দেবেন সেইটাই আগে ঠিক করা চাই।

পাঠান এবার একটু ভীত হইয়া বলিল, "কেন ভাই, আমার তো সেখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছা একটুও ছিল না। তোমরাই তো আমাকে তাড়ালে।"

প্রথম। দেখ, এখন উল্টা চাপ আমাদের ঘাড়ে। আচ্ছা, কার ঘাড় কত শক্ত, সময়ে বোঝা যাবে।

পাঠান এবার ভারি ভালবাসা দেখাইয়া বলিল, "সে কথা কি আমি রাজপুত্রকে বল্‌তে যাচ্ছি। দোষ ত্রুটি সকলেরই আছে, নিজেদের ভিতর মিল থাক্‌লে, তাহা আর জানতে পারবে কে?"

দ্বিতীয়। ব্যাপারটা কি বুঝলাম না।

পাঠান। আরে, সেই যে মনে নাই। আমি যেমন ধরতে যাব, তোমরা অমনি আমার সমুখে গিয়ে দাঁড়ালে। যার যে কাজ তাকে তাই করতে দিতে হয়। নহিলে সব পণ্ড হয়ে যায়।

একটু কৃত্রিম রোষে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "অমন মিথ্যাবাদী জিবটাকে ইচ্ছা হয় খণ্ড করে ফেলি।"

প্রথম ব্যক্তি অনুপ্রাস মিলাইয়া বলিল, "তুমিও যেমন,

ভণ্ডের সঙ্গে আর বেশী যণ্ডামি করে কি হবে। পার তো শুধু দাড়ীটা ধরে একটু লণ্ড ভণ্ড করে দাও।”

পাঠান এবার বিশেষ ভয় পাইল। কি জানি দুইজনে মিলিয়া যদি কিছু করিয়াই ফেলে। বলিল, “না ভাই, এখন ভুলটা ভেঙ্গেছে। গোলমালে কি হতে কি হয়েছিল, তাহা কি শীঘ্র স্থির করা যায়? এখন ঠিক মনে আসছে বটে। তোমরা তো নও, সেই দু’টোই আমাকে আটকেছিল। বেটারা ভেবেছিল, আগে টপ্‌কে গিয়ে বাহাদুরী নেবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। জানও গেল, শিকারও ভাগলো।”

আহত দলপতি বলিল, “কেন আর বকছো। তুমি যে এমন বস্তু তা আমি আগে জানতাম না। চল, সে কাজের পুরস্কারটা এখন তোমাকেই দেওয়া যাবে।”

পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদ্বয়কে পরে কহিল, “সে লোকটা কে, তোমরা কেহ চিন্‌তে পারলে?”

দ্বিতীয়। আমার তো একটু সন্দেহ হয়।

দলপতি। কাহাকে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি দলপতির দিকে ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে কি বলিল। দলপতি ও তৎপার্শ্বস্থ সঙ্গী কেবল তাহা শুনিতে পাইল। দলপতি কহিল, “আমারও মনে ঐটা আস্‌ছে। চিতোরের মধ্যে সে বর্ষায়ও অদ্বিতীয়।”

প্রথম। সে কি হে, লোকটা কি এতদূর করবে। বেশ যে বিষয়-সম্পত্তি-ওয়ালা।

দ্বিতীয়। ভালই, আরো বাড়্‌বে। অমন ডাকাতের

সর্দারটাকে হাত করতে পারলে, অনেকে অনেক কাজ গুছিয়ে নিতে পারে।

প্রথম। চোরের উপর বাটপাড়ও আছে, ভায়া।

দ্বিতীয়। ধরা পড়্‌লে তো। যারা আগুতে চায়, তারা কি এত ভয়ে ভয়ে পা বাড়ায়?

প্রথম। কিন্তু ভাই রাজা লোকটাকে খুব খাতির করে।

দ্বিতীয় অনুচ্চস্বরে কহিল, "তবে জেনো, নিশ্চয়ই এর ভিতর কিছু গলদ আছে। দাদা, রাজার প্যাঁচ ভারি জটিল। যার তার খোলবার সাধ্য নাই। যেখানে দেখ্‌বে আজ পিঠে হাত, জানবে সেইখানেই দু'দিন পরে গলা ধাক্কা।"

প্রথম। যাই হোক, তা হলে তো এখন লোক চেনা দায়। সকলকেই দেখছি এখন মুখস-পরা বলেই ভেবে নিতে হবে।

দ্বিতীয়। যে দিন-কাল পড়েছে কাহাকেও বিশ্বাস নাই। সম্মুখে দেখ্‌তে দিব্য মেষশাবকটি, কিন্তু আড়ালে একেবারে আস্ত নেকড়ে বাঘ।

দলপতি এবারে বলিল, "ইহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি দেখি না। নকল ছিঁড়ে আসল বার্‌ করতে পারলে আমাদেরই বেশ চল্‌বে।"

উহাদের অনেক কথাই গণেশপ্রসাদের শ্রুতিগোচর হইল। যাহা হউক, তিনি একটা উৎকণ্ঠা হইতে রক্ষা পাইলেন। হাম্বিরের প্রতি গণেশপ্রসাদের সহানুভূতি থাকিলেও, বাস্তবতঃ কোন প্রকারে তাঁহার দলের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। পান্থশালায় রাত্রি যাপন করিয়া হাম্বিরের সম্বন্ধে কোন

সংবাদই তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কি করিয়া যে তাহা পারিবেন, ইহারও কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না। হঠাৎ দৈবক্রমে এই সুবিধা মিলিয়া গেল। গৃহে গিয়া গৃহিণীর সকাশে সব নিবেদন করিলেন। শুনিয়া শান্তা ভারি খুসী হইয়া কহিলেন, "যাও ওস্তাদজী, এখন তুমি তোমার শেষ পদটা ধরগে।"

গণেশ। এখন অপরকে ধরিব কি, নিজে ধরায় না পড়ি।

সত্যই গণেশপ্রসাদ দণ্ডায়মানা পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া কথা বলিতে বলিতে ঢুলিতেছিলেন। শান্তা কহিলেন, "তাই তো, শরীরটা যে নিতান্ত গদগদ হইয়া পড়িয়াছে। দেখো, গানের পদটা ছাড়িয়া দিয়া যেন মানুষের পদটা ভাঙ্গিয়া দিও না। এখন উঠ, গৃহিণীর রঙ্গ অপেক্ষা এখন খট্টাঙ্গের সঙ্গটাই বেশী ভাল লাগিবে।"

অচিরেই গণেশপ্রসাদের নাক এবার আসল সুরে বাজিতে লাগিল। শান্তা ইত্যবসরে একবার রাজবাড়ী গিয়া উৎকণ্ঠিতা শিবানীকে সব জানাইয়া আসিলেন।

ওদিকে অকৃতকার্য্য গুপ্তচরেরাও প্রভাতে হরিসিংহের নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিল। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া হরিসিংহ তৎক্ষণাৎ সেই বন্দীকে কারাগার হইতে আনাইলেন। দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া কহিলেন, "প্রবঞ্চক, সব ব্যর্থ করিলি!"

বন্দী জিজ্ঞাসা করিল, "অশ্বারোহীকে ধরিতে পারেন নাই?"

হরিসিংহ। তোর চক্রেই তো সে পলাইল।

বন্দী মুক্তকণ্ঠে বলিল, "মূর্খ, সন্ধান জানিলেই বা তোমাকে বলিব কেন!

হরিসিংহের আপাদমস্তক প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। তরবারি তুলিয়া কহিলেন, "এ ছলনার ফল তবে ভোগ কর্।"

বন্দী উৎফুল্ল মুখে হাসিয়া কহিল, "হরিসিংহ, এ জীবন অতি তুচ্ছ। যে শুভসংবাদ পাইলাম, তাহার বিনিময়ে ইহার মূল্য কিছুই নহে।"

রাক্ষসস্বভাব হরিসিংহের করে বন্দীর জীবন অচিরেই শেষ হইল। লোকচক্ষুর অগোচরে এইরূপ কত আত্মদান জগতে সাধিত হয়। ইতিহাসের অধিকার অতি সামান্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আলাউদ্দিনের অত্যাচারে কয়েক বৎসর মাত্র চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছে। রাজপুত বীরদিগের যে হৃদয়শোণিত সমরক্ষেত্র রঞ্জিত করিয়াছিল, তাহা ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি চতুর্দ্দিকে অস্থিপুঞ্জ আত্মদানের জীবন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ রাখিয়াছে। জহরব্রতের পবিত্র অগ্নি নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু কত স্থলে ভস্মস্তূপে রাজপুত নারীর সাহস ও সতীত্ব মূর্ত্তিমান রহিয়াছে। অসংখ্য বীরবৃন্দের সহিত রাণা লক্ষ্মণসিংহ সপরিবারে প্রাণ দিলেন, অসংখ্য নারীগণের সহিত পদ্মিনী অনলে পুড়িলেন; তথাপি ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন না। চিতোর পাঠানের অধিকার-

ভুক্ত হইল। একজন স্বজাতিদ্রোহী নীচাশয় সামন্ত তাহার সিংহাসনে অধিরূঢ় রহিল। ইহারই নাম মালদেব।

এই মালদেব যেমন স্বার্থান্ধ তেমনই কুচক্রী। স্বার্থের খাতিরে তিনি সবই করিতে প্রস্তুত। প্রতিপক্ষের দমন ও অবমাননাকল্পে নানা উপায় উদ্ভাবনেও তাঁহার মস্তিষ্ক সদাই উর্বর। বিজয়ী পাঠান এই মালদেবকেই বাছিয়া নব অধিকারের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিলেন। আলাউদ্দিন বুঝিয়াছিলেন এই সামন্তের ভিতরে এমন কোন উচ্চবৃত্তি নাই, যাহার প্ররোচনায় তিনি মুক্তি ও পাশকে প্রভেদ করিতে পারেন। তাঁহাকে যতই অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধা হউক, চিতোর ও অর্থ পাইলে, তিনি কখন তাহা ছিঁড়িতে চেষ্টা পাইবেন না। আলাউদ্দিনের এ ধারণা বাস্তবিক মালদেব চির-অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছিলেন। মালদেবের অনেক সন্তান থাকিলেও, তাঁহার কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন মধ্যম রাজকুমার হরিসিংহ। এই হরিসিংহের পরিচয় কতক পাওয়া গিয়াছে, মালদেবের জ্যেষ্ঠাত্মজেরও বিষয় পরে জানা যাইবে। তাঁহার নাম বনবীর। হরিসংহ যেমন পিতার প্রকৃতি পূর্ণরূপে পাইয়াছিলেন, মালদেবের অপর সন্তানেরা সেইরূপ কিছুই পান নাই।

মধ্যম অজয়সিংহ ব্যতীত রাণা লক্ষ্মণসিংহের সকল পুত্রই সেই ভীষণ সমরে একে একে জীবন আহুতি দিয়াছিলেন। পুত্রের আগ্রহসত্ত্বেও রাণা স্নেহাধিক্যবশতঃ তাঁহাকে সহোদরদিগের অনুগামী হইতে দেন নাই। চিতোর পাঠান কর্ত্তৃক কবলিত হইলে, অজয়সিংহ কৈলবারায় যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই কৈলবারা চিতোরের কিছু দূরে আরাবল্লির সানুদেশে স্থাপিত একটি নাতিবিস্তৃত জনপদ। আদিম অসভ্য জাতিদিগের ইহা

বাসস্থান। নৈসর্গিক শোভার ইহা আধার। কোথাও হরিৎ শস্যক্ষেত্র বাতাসে দুলিতেছে, কোথাও শ্যামল চারণভূমিতে মেষগবাদি চরিতেছে, কোথাও নির্ম্মল নির্ঝরিণী কলনাদে দিগন্ত ভরিয়া ছুটিতেছে। বিজন অরণ্যে এবং দুরারোহ পর্ব্বত-মালায় এই প্রদেশ অতি দুরধিগম্য। সহসা কেহ যে ইহার কূট পন্থা ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া ইহাতে প্রবেশ করিবে, সে উপায় নাই।

অজয়সিংহ এই নিরাপদ স্থানে আসিয়া বাস করিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার দুইটি পুত্রও ছিল। অজয়সিংহ নিয়ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া চিতোরের উদ্ধারসাধন হইবে। এখন তিনি নিতান্ত নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। ক্রমে তাঁহার লোকবল বাড়িতেছে বটে, কিন্তু তাহা শিক্ষিত ও অগণিত শত্রু চমূর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে অনেক বিলম্ব। তাঁহার জীবদ্দশায় যে তিনি কিছু করিতে পারিবেন, এমন আশা নাই। বার্দ্ধক্যে ও চিন্তায় তাঁহার শরীর ক্রমশঃ অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। কাহাকে যে তিনি এই পবিত্র উদ্ধারব্রতের ভার দিয়া যাইবেন, তাহাও দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার পুত্র দুইটির মধ্যে কাহারও এমন ইচ্ছা ও শক্তি নাই যে, এই ব্রত পালন করিতে পারে। ক্রমে সমস্ত কৈলবারা তাহার অধীন হইয়াছে, কিন্তু ইহার যোগ্য উত্তরাধিকারী কে?

এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর অরিসিংহের পুত্র হামিরের তিনি সন্ধান পাইলেন। একদা মৃগয়াকালে অরিসিংহ এক কৃষকদুহিতার অদ্ভুত শক্তিসন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হামির এই মহাবীর্য্যবতী রাজপুত মহিলার

গর্ভসম্ভূত। তিনি এক্ষণে মাতুলালয়ে কৃষকদিগের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। অজয়সিংহ তাঁহার গুণগ্রাম শ্রবণে তাঁহার প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহাকেই এই মহৎকার্য্যের উপযোগী অস্ত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন।

হামিরকেই অজয়সিংহ উত্তরাধিকারী করিবেন জানিয়া তাঁহার পুত্র দুইটি মনোদুঃখে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দ্বিতীয় সুজনসিংহ দাক্ষিণাত্যে গিয়া যে বংশতরু-রোপণ করেন, তাহা হইতেই ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রীয় শিবাজীর উৎপত্তি। পথিমধ্যেই নাকি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় জ্যেষ্ঠ আজিমসিংহের জীবনলীলার অবসান হয়। ওদিকে হামিরের প্রতাপ ও প্রতিভা দিন দিন অদম্য ও উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। মুঞ্জনামক একজন ভীল সর্দ্দার অজয়সিংহের দুর্দ্ধর্ষ শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। হামির অতি অল্প সৈন্যের সাহায্যেই তাহাকে সমূলে বিনাশ করিলেন। খুল্লতাত অজয়সিংহ ইহাতে বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি বংশের প্রথানুসারে হামিরকে সেই অরণ্যবাসেই রাণাপদে অভিষিক্ত করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে অজয়সিংহ স্বর্গারোহণ করিলে, হামির কৈলবারার একমাত্র অধিপতি হইলেন। দলে দলে স্বাধীনচেতা রাজপুতগণ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। কিন্তু এখনও তিনি সম্মুখ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন না। গোপনে গোপনে নানা প্রকারে শত্রুপক্ষের ক্ষতি করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের প্রধান উপকরণ অর্থ। শত্রুরাজ্য লুণ্ঠন করিয়া তাহা তিনি অনেক সংগ্রহ করিলেন। হামিরের কূট যুদ্ধনীতিতে ক্রমে এমন হইল যে, বড় বড় নগর ব্যতীত মালদেবের রাজ্য একপ্রকার

জনহীন হইয়া পড়িল। গৃহ পড়িয়া আছে, বাসী নাই; ক্ষেত্র পড়িয়া আছে কৃষাণ নাই, পথ, ঘাট, মাঠ রহিয়াছে, লোকের গতিবিধি নাই। এদিকে গ্রামের পর গ্রাম অরণ্যে পরিণত হইতেছে, ওদিকে কৈলবারার অরণ্যে নূতন নূতন গ্রাম বসিতেছে।

মালদেব হামিরের কৌশলময় আক্রমণেও অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া তাহার প্রতিকারেরও পথ পাইলেন না। পুত্র হরিসিংহও প্রাণপণে লাগিয়াছেন, যেখানে হামিরের আপতন শুনিতে পান, সেইখানেই সসৈন্যে উপস্থিত হন, কিন্তু কিছুই এ অবধি করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বেশী সৈন্য লইয়া যাইলে, হামিরের দল যে কোথায় সহসা অন্তর্হিত হয়, তাহার চিহ্ন মিলে না। অপেক্ষাকৃত অল্প সৈন্যের সাহায্যে গোপনে কোন চেষ্টা পাইলে, সহসা ঝটিকার মত হামিরের দল তাহাদের উপর পড়িয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে।

যে মোহান্ধ বাদশাহ রূপের লালসায় হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া চিতোরের এই মহা অনর্থ সংঘটন করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ এখন কবরের মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে। মহম্মদ নামধেয় একজন আলাউদ্দিনের উত্তরাধিকারী অধুনা দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। নিজেকে রাজাই বলুন আর যাহাই বলুন, মালদেব মহম্মদেরই বশ্য ভৃত্যরূপে এখন চিতোর শাসন করিতেছেন। মালদেবের সহস্র প্রয়াস বিফল করিয়া হামিরের শক্তি ওদিকে বাড়িয়া উঠিতেছে। পুরাবৃত্তের এইখানেই এই আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর মন্ত্রণাগৃহে পিতাপুত্রে একত্র হইয়াছেন। মালদেবের বয়স পঞ্চাশতের কিছু উপর হইলেও, শরীর বেশ শক্ত ও কর্ম্মঠ। হরিসিংহ পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় বলবান যুবা। হরিসিংহ এবার আশা করিয়াছিলেন, রাজ্যের শত্রুকে কৌশলে বন্দী করিয়া একেবারে রাজার সম্মুখে হাজির করিবেন। তাঁহার সে আশা বিনষ্ট হওয়ায়, ক্ষোভ ও রোষে তাঁহার বদন বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কিছুতেই তিনি আর মনের প্রকৃত অবস্থা ঢাকিতে পারিতেছেন না। মালদেবের বাহিরটা নিস্তরঙ্গ সলিলবৎ বেশ শান্ত, কিন্তু তাহার নীচে যেন হিংস্র যাদোগণ করাল বদন ব্যাদন করিতেছে। মালদেব কহিলেন,—

"আর কোন সংবাদ আছে?"

হরিসিংহ শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন, "শত্রু তো কোন দিন বসিয়া থাকে না। নিত্যই কিছু না কিছু করিতেছে। তবে আর তাজা খবরের ভাবনা কি?"

মালদেব। এবারে লুণ্ঠন, না সন্ধান?

হরিসিংহ। কোনটাই ফাঁক যায় নাই।

মালদেব। দূরে, না নিকটে?

হরিসিংহ। দুই স্থানেই। পরশ্ব বিজয়গ্রাম ভস্মীভূত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা অনেকে নিজের গৃহে নিজে আগুন দিয়া পলাইয়াছে।

মালদেব। লোকগুলা নিতান্ত ক্ষেপিল নাকি? পাহাড়ে

তাহাদের অন্ন কতকাল জুটিবে! আবার যখন ফিরিয়া আসিতে হইবে, তখন মালদেব কি তাহাদের মাথায় সোনার তাজ পরাইয়া দিবেন? কি মূঢ়তা!"

হরিসিংহ অধীরভাবে কহিলেন, "তখন এক একটাকে ধরা যাইবে, আর সাত দিন ধরিয়া ছেদন চলিবে। আজ হাতটা, কাল নাকটা, পরদিন কানটা। এইরূপ শাস্তি দিতে পারি, তবে যদি বেহুঁসদের একটু শিক্ষা হয়।"

মালদেব শান্তভাবেই বলিলেন, "যাক, সে তো ভবিষ্যতের কথা। এখন বর্ত্তমানে করণীয় কি?"

হরিসিংহ। বর্ত্তমানে কিছুই তো করিবার দেখি না, যাহা কিছু দেখি কেবল সহিবার।

মালদেব। কিন্তু আমরা এরূপ সহিলে, বাদশাহ তো আমাদের আচরণ সহিবেন না। তিনিও দেশের সংবাদ রাখিতেছেন।

হরিসিংহ। এদিকে দেশ যে তাঁহাকে রাখিতে চাহে না। শুধু গাছপালা মাটিতে তো দেশ হয় না। যাহারা গাছপালা মাটির রক্ষক, তাহারা স্বেচ্ছায় সেই বন্য ভল্লুকটার কাছে জড়ো হইতে আরম্ভ দিল।

মালদেব। যেমন করিয়া হউক, ইহার একটা প্রতীকার বড়ই আবশ্যক। দেশ যদি আমরা না রাখিতে পারি, বাদশাও কি আমাদের আর দেশে রাখিবেন? এতো সেই আলা-উদ্দিনের বংশধর।

হরিসিংহ। বরং আলাউদ্দিন ছিল ভাল। লোকটা কড়া হইলেও, সাহসী ছিল। এখন এ একটা কে মেনীমুখো রাজতক্তে

উঠিয়াছে। কাজে কিছুই নয়, কেবল মুখে সাপট। আমার ইচ্ছা করে, এটার সঙ্গে সম্বন্ধ কেটেই দি।"

— মালদেব চারিদিকে শঙ্কিতভাবে তাকাইয়া কহিলেন, "এমন কথা মুখে আনিও না। উনি যাহাই হউন, পশ্চাতে আছেন বলিয়াই লোকে এখনো একটু আমাদের ভয় করে। নহিলে দুইদিনে উড়াইয়া দিতো।"

হরিসিংহ। কেন, আমাদের কি নিজের সৈন্যবল নাই?

মালদেব। কিন্তু রাজ্যের সমস্ত লোকের তুলনায় সে কতটুকু।

হরিসিংহ। সকলেই কি আমাদের বিপক্ষে? অনেকে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো তো অনেকে আছে।

মালদেব। হরিসিংহ, যাহারা আছে তাহারা যায় নাই কেবল ঐ মুসলমানের ভয়ে। যদি এই ভয়ের বন্ধন আজ ছিঁড়িয়া যায়, দেখিবে কাল সব ওপক্ষে দাঁড়াইয়াছে। আচ্ছা, দূরের কথাটা তো শুনিলাম, নিকটে আবার কি হইল?

হরিসিংহ। এবার সেই ধূর্ত্ত আপনার প্রাসাদেই পদার্পণ করিয়াছিল।

মালদেব সবিস্ময়ে কহিলেন, "বল কি, এত সাহস! তুমি কি করিয়া জানিলে? বোধ হয়, এটা মিথ্যা জনরব।"

হরিসিংহ। স্বচক্ষে না দেখিলে, আমারও তাহাই মনে হইত।

মালদেব। নিজে দেখিয়াছ? তবুও কিছু ফল হইল না?

হরিসিংহ ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "শুধু তাহাকে দেখি নাই, আরো অনেক দেখিয়াছি ও অনেক করিয়াছি।"

হরিসিংহ গবাক্ষপথে দৃষ্ট রাজোদ্যানের সেই মিলনদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিলেন। মালদেব শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। পরে যেন কি একটা চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন,—

"শিবানীকে এ সম্বন্ধে কিছু যেন এখন জিজ্ঞাসা করা না হয়। সুবিধামতে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিব। বৎস, এ একটা সুযোগ মিলিয়াছে। হামির যেরূপ প্রজাসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, সহসা তাহার প্রাণহানি করা—যদি তাহার সুবিধাই হয়—আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। প্রজারা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের উপর হঠাৎ খড়্গহস্ত হইতে পারে। অবশ্য আমরা এই আশঙ্কা সত্ত্বেও এই চেষ্টাই করিতেছিলাম এবং উপায়ান্তর না দেখিলে তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আর একটা সঙ্কল্প আমার মনে আসিতেছে। তাহাতে প্রতিশোধও আছে এবং বিনা রক্তপাতে লাভও আছে! আমি আরও ভাবিয়া দেখিয়া তোমাকে সব জানাইব।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সেইরূপ সায়াহ্নে সেই উদ্যানে শিবানী ও শান্তা বেড়াইতে আসিয়াছেন। শান্তা কহিলেন, "বিপদ তো কাটিল, এখন সম্পদ লাভের কি উপায়?"

শিবানী হতাশস্বরে বলিলেন, "সব কাজেই কি আর লাভ মিলিয়া থাকে?

শান্তা। তুমি কেমন ব্যবসায়ী, সই। নৌকা ঝড় কাটিয়া উঠিল দেখিয়াই নিশ্চিন্ত। তাহাকে কূলে টানিবে না?

শিবানী। টানিলেই সে আসিবে কেন?

শান্তা। তোমার ধন রত্ন তাহার বক্ষে রাখিয়াছ, তাহাকে অমনিই ভাসিয়া যাইতে দিবে?

শিবানী। যাহা রাখিয়াছি, তাহার উপর তো কোন স্বত্ব নাই।

শান্তা। না কুমারীজী, যে ফাঁকি দিয়া পলাইতে চায়, সে চোর। আমি হইলে এমন চোরা প্রেমতরীকে কাণ্ডারী সমেত নিজের ঘাটে আনিয়া বাঁধিয়া রাখিতাম।

শিবানী একটু মৃদুহাস্যে এবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"গায়ের জোরে নাকি?"

শান্তা। যদি তাহাই হয়।

শিবানী আবার পূর্ব্ববৎ নৈরাশ্যমাখা স্বরে কহিলেন, "বৃথা চেষ্টা। যত বাঁধিতে যাইবে, তত সে কাছি ছিঁড়িবে।"

শান্তা। তবে কি এ কাজটা শুধু নিভাজ বোকামি? এখন কি সব খোয়াইয়া শূন্যহাতে বসিয়া থাকিবে?

শিবানী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন, "যদি ইহাই বিধির বিধান হয়, তবে অন্যথা কে করিবে, শান্তা?"

শান্তা। সেই বৃদ্ধ দেবতা কি এতই নিষ্ঠুর?

শিবানী। নিষ্ঠুর না হউন, তিনি দুর্ব্বোধ্য। চক্রবাকমিথুনকে তিনি রজনীতে বিভক্ত করিয়া রাখেন, আবার প্রভাতে একত্র

করেন। এই জীবন-নিশার অবসানে তিনি হয় তো মিলনের প্রভাত আনিবেন। শুনিয়াছি একমনে যে যাহা চায়, এখানে না হউক, সেখানে সে তাহা পায়।

শান্তা। পরকালের আদালতে গিয়া তবে ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে হইবে, এ যে সই অনেক দূরের কথা। এত দূরদর্শিতা আমার নাই, আমি চাই সোজাসুজি বিচার।

শিবানী। কিন্তু সে আদালত ভিন্ন আর কোথা অসম্ভব সম্ভব হয়। অতি যে দীন, সেও তাহার আকাঙ্ক্ষিত ফল পায়। তিনি মহা গৌরবান্বিত রাণাবংশধর, আমি অবজ্ঞাত সামন্তদুহিতা। আমাদের মধ্যে যোগসূত্র কি আছে?

শান্তা কিছু উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, "সূত্র কি শুধু পদে আর কুলে? প্রেমের মর্য্যাদা কি জগতে নাই? অরিসিংহ রত্ন চিনিতেন, অতি সামান্য আকর হইতে তিনি তাহা আহরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কি একেবারে অন্ধ?"

শিবানী। শান্তা, তোমার স্নেহের কষ্টিপাথরে আমার মূল্য বাড়িলেও, বাস্তবিক জিনিষটা তো ঝুটা। আর ধর যদি কিছু দামই থাকে, কিন্তু বংশগত বৈষম্য নিরাকৃত হইলেও, এই রাষ্ট্রগত বিরোধের মীমাংসা করিবে কে? পিতা যাঁহার বিলোপের জন্য নিয়তই শস্ত্রপাণি, তনয়া সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহাকে বেড়িয়া রাখিতে চায়, এ যে এক মহা জটিল সমস্যা। মানুষের হস্ত এস্থলে কি করিবে?

শান্তা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তুমি যাহাই বল, আমি কিন্তু এক হংসের চেষ্টায় আছি।"

শিবানী। যে সে কি আর দময়ন্তী সাজিলেই হয়। এতো যাত্রার সং নয়।

শান্তা শিবানীর নৈরাশ্যমাখা মুখখানি বাহুর উপর রাখিয়া উন্নমিত করিয়া প্রশংসা-বিস্ফারিত নয়নে দেখিতে দেখিতে গর্ব্বিতস্বরে কহিলেন,—

"এতেও যদি তিনি না ভোলেন, জানিব, তাঁহাকে দশটা কলি ও বিশটা শনিতে ঘেরিয়াছে।"

শিবানী। নিজের অদৃষ্টে সুখ নাই, পরকে শাপ দিয়া কি ফল?

শান্তা দেখিলেন প্রিয়তমের প্রতি একটু তিরস্কারও শিবানীর সহ্য হয় না। হামির যে হরিসিংহের ষড়যন্ত্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াও এ অবধি শিবানীর কোন উদ্দেশ লইলেন না, ইহাতে নৈরাশ্য থাকিলেও ক্ষোভ নাই। শান্তা মনে মনে শিবানীকে ধন্যবাদ দিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"আচ্ছা, সই, শনিতে কাজ নাই তিনি মঙ্গলেই থাকুন। আর সত্যে থাকিলে কলিই বা করিবে কি। তুমি যক্ষ হইলে আমার এক খণ্ড মেঘ ছিল, তবে তাহাকে উড়াইবার মত বাতাস মিলিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের একটি ক্ষিপ্রগামী হংসেরই প্রয়োজন।"

"হংসী হইলে কি চলিবে না?"—সহসা উদ্যানচারিণীদ্বয়ের প্রায় পৃষ্ঠের নিকটে এই কয়টি কথা মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা এক অলোকসামান্যা ত্রিশূলধারিণী নবীনা ভৈরবী। ভৈরবীর কোমল ও শান্তরূপ দর্শনে শান্তার মনে কোন ভক্তি

আসিল না, বরং তাহা একটু স্নেহরসে সিক্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বের কোন পরিচয় না থাকিলেও, প্রগল্ভা শান্তা কহিলেন,—

"হংসীর সহিত তোমার গতির তুলনা হইতে পারে বটে। গ্রীবাখানিও ঠিক তাহারই মত। এই ভৈরব বেশটাও ঐ দেহে উঠিয়া নিতান্ত ললিত হইয়া পড়িয়াছে।"

ভৈরবী স্মিতমুখে বলিলেন, "এ ত্রিশূলটাও কি একটু মানায় নি ?"

শান্তা। ওটাও যেন মৃণালের কাঁটার ন্যায় দেখাইতেছে। তাহার চেয়ে একটু ভীষণ ভাব উহাতে নাই। আর এটার দরকারও তো কিছু দেখিতে পাই না।

ভৈরবী পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "কেন ইহাতে কি দৈত্যবিনাশের যোগ্য শক্তি নাই ?"

শান্তা। দুইটা নয়নে যে প্রহরণ আছে, তাহাই তো সমস্ত সৃষ্টিটাই শাসন করিতে সক্ষম। দোষীর দণ্ডের জন্য আর এ লৌহদণ্ডে কি কাজ ?

ভৈরবী। সে প্রহরণের শাসন কেবল একজনের প্রতিই প্রযোজ্য।

শান্তা। মরালীর দেখিতেছি, তবে মরালও আছে।

ভৈরবী। ছিল বটে, কিন্তু কয়েকদিন হইল কি মনের বিরাগে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

শান্তা। এখন কি তাহারই অন্বেষণে ফিরিতেছ ?

ভৈরবী। তা বৈ কি বোন। কি জানি, কে এই সুযোগে হংসকে আমার আটক করিল বুঝি।

শান্তা। তুমি বোন, নিজের খালি পিঞ্জর লইয়াই অস্থির।

এখন কি পরের পিঞ্জর পূর্ণ করিবার অবসর তোমার হইবে?

শিবানী ও শান্তা যখন নিবিষ্টচিত্তে কথোপকথনে নিরত ছিলেন, তখন তাঁহাদের কিয়দ্দূরে থাকিয়াই ভৈরবী তাহার কিছু শুনিয়াছিলেন। ভৈরবী কহিলেন, "যে শূন্যতার দুঃখ নিজে ভোগ করিয়াছে, সেই অপরের সে দুঃখ বুঝিতে পারে। আমি যথাসাধ্য তোমার সহচরীর দৌত্য করিব। সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাক।"

নিতান্ত অপরিচিত হইলেও, ভৈরবীর কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া শিবানী ও শান্তার মনে কিছুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হইল না। কিয়ৎক্ষণের আলাপেই তাঁহারা তৎপ্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। শান্তা শেষে ভৈরবীকে সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার দৌত্যের প্রণালীটা বুঝাইয়া দিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ভৈরবী সমাগত সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রাসাদ বেড়িয়া চলিলেন। আশে পাশে দুই একটা দীপ জ্বলিতেছে, তাহার আলোকে দাঁড়াইয়া দুই একজন প্রহরীও ক্ষুধায় জ্বলিতেছে। তবে দুইটা জ্বলার মধ্যে অনেক ভিন্নতা। দীপ সমস্ত দিনের অবসরের পর এখন বেশ তাজা ও উজ্জ্বল, আর প্রহরী সমস্ত দিনের শ্রমে এখন শুষ্ক ও মলিন। ভরা দীপ এখন আর নূতন তৈলের ভিখারী নহে, তাই সে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, শূন্যোদর প্রহরী অভাবে

ম্রিয়মাণ হইয়া দীননয়নে দেখিতেছে, তাহার দৈনিক পর্য্যায়ের এই শেষে তাহার দোসর আসিতেছে কি না। কিন্তু এই দোসরদিগের ভিতরে পরিশ্রান্তদিগের সাহায্যার্থ তেমন আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে না। তাহারা মৃদু মলয়ের মত দিব্য হেলিয়া দুলিয়া, বুক ফুলাইয়া চলিতেছে। এমন কি কেহ কেহ ইতস্ততঃ সঞ্চরমানা দাসীদিগের সহিত ইহার মধ্যে একটু ছোটখাট আলাপও সারিয়া লইতেছে। রসপূর্ণ নবীন প্রহরীর মধ্যে এই আলাপের আঘাতে ভাবের তরঙ্গ উঠিলেও, দূরে দণ্ডায়মান নীরস সহচর কিন্তু ইহাতে ফাটিয়াই যাইতেছে।

ভৈরবী ক্রমে প্রাসাদের সম্মুখদেশে আসিয়া পড়িলেন। একটু দাঁড়াইয়া যেন মনে মনে কি ঠিক করিয়া লইলেন। প্রাসাদের যে ভাগে বন্দীরা রক্ষিত হইত, এবার তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে প্রহরীদিগের সংখ্যা ও সতর্কতা বেশী রকম হইলেও, তিনি কোন বাধা পাইলেন না। নিশার আবরণে তাঁহার রূপ ও বয়স কিছু অলক্ষ্য থাকায়, তাঁহার ভৈরবীর সাজ এবার বেশ খুলিয়াছিল। সকলেই ভক্তিভাবে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি অল্প আলোকে কথঞ্চিৎ আলোকিত গৃহ মধ্যে কেহ আসীন, কেহ শয়ান, কেহ দণ্ডায়মান বন্দীদিগকে দেখিতে দেখিতে বহিঃস্থ পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে কারাগারের সীমার শেষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার কক্ষটি অপেক্ষাকৃত আয়ত ও পরিস্কৃত। তাহার সম্মুখে পথের ধারে একটি বড় ফুলের গাছের নীচে বসিবার প্রস্তরনির্ম্মিত আসন ছিল। ভৈরবী একটু বিশ্রামার্থ সেদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন,

কক্ষের ছাদের উপর একজন দাঁড়াইয়া আছে। বেশভূষা দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে তাহাকে উচ্চ শ্রেণীর লোক বলিয়াই মনে হইল। নিম্ন হইতে একটা দীপের আলোক ঐ ছাদের একাংশে গিয়া পড়িয়াছিল, বন্দী ধীরে ধীরে সেইখানে সরিয়া গেল, এবার আলোক তাহার ঠিক মুখে লাগিল।

ভৈরবী যেন কিসের আঘাতে পতনোন্মুখ হইয়া ত্রিশূলটা মাটির উপর জোর করিয়া ধরিলেন। যেন কত প্রকারের আভ্যন্তরিণ তরঙ্গ তাঁহার অন্তরের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বিস্ময়, দুঃখ, নিরাশা, আশ্বাস, আনন্দ সকলেই যেন ক্ষুদ্র হৃদয়খানা কাঁপাইয়া, দোলাইয়া, ফুলাইয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ বন্দী ছাদে থাকিল, তাঁহার গুপ্ত আশ্রয় হইতে নীরবে ভৈরবী তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বন্দী তিরোহিত হইলে, ভৈরবী ভাষা নহে, ইঙ্গিত নহে, শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস মাত্র সেখানকার বাতাসে রাখিয়া বৃক্ষতল ছাড়িলেন। কিছু দূর গিয়া আবার একটা ঐরূপ বৃক্ষ পাইলেন। এখনও বন্দীর লৌহদণ্ডবেষ্টিত ছাদ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মুগ্ধা আবার এখানেও কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইলেন, আশা যদি আর একবার সেই মুখখানি দেখিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু নয়ন ছাদের দিকে থাকিলেও, শ্রবণ এবার অন্যত্র আকৃষ্ট হইল। প্রাসাদের উপরস্থ কক্ষ হইতে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দেখিতে না পাইলেও শুনিতে পাইলেন, একজন যেন অপরকে বলিতেছে,—

"শত্রুর সহিত কিছুদিন মিত্রতাই পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

তুমি অদ্য রাত্রেই যাত্রা কর, অচেনা পথে যাইতে তোমার অনেক সময় লাগিবে। হামিরের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিও না। যদি কৈলবারায় না থাকে, অপেক্ষা করিও। কহিও তাঁহার উপযোগী যৌতুকও প্রদত্ত হইবে।”

অন্য কণ্ঠ উত্তর দিল, “মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য। এখনই যাত্রা করিলাম।”

ইহা ভিন্ন ভৈরবীর আর কিছুই কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু এই কয়টি কথাই তাঁহার মনে নানাপ্রকার সম্ভাবনীয় ঘটনার সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে লাগিল। শেষে একটা যেন কি নির্দ্ধারণে তিনি উপনীত হইলেন। পিপাসু লোচন আর একবার ছাদের দিকে রাখিয়া ভৈরবী অনতিবিলম্বেই রজনীর বক্ষে মিশিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হামিরের অভ্যুত্থানে যখন নানাদিক হইতে লোক আসিয়া কৈলবারায় বাস করিতে লাগিল, তখন একজন সন্ন্যাসী একটি বালিকা কন্যা সমভিব্যাহারে তথায় আবির্ভূত হইলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ হামির সম্মান ও ভক্তি সহকারে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। সন্ন্যাসীরই ইচ্ছাক্রমে সেই জনপদের এক সীমান্তে তাঁহার আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

এই সন্ন্যাসী বৃদ্ধ নহেন, এক্ষণে তিনি চল্লিশেরও কিছু

ন্যূন হইবেন। সন্ন্যাসী যখন প্রথম এখানে আসিয়াছিলেন, তখন চপলা দ্বাদশবর্ষীয়া। সন্ন্যাসীর পরিচয় সম্বন্ধে লোকে এইটুকু জানিত যে, তিনি পূর্ব্বে সংসারী ছিলেন। চপলার জন্মিবার কিছু পরেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তখন হইতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

কিয়দ্দিনের মধ্যেই তাঁহার উদার ধর্ম্মমতের সহিত প্রগাঢ় চিতোর-বাৎসল্যের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিয়া হামির তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন। হামির দেখিলেন, এই সন্ন্যাসী অপরাপর সন্ন্যাসধারী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি গৈরিক পরিতেন এবং দণ্ড ও কমণ্ডলুও লইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার উপদেশ ও আচরণ একটুও নির্লিপ্ত বৈরাগীর ন্যায় ছিল না। পার্থিব কথায় কান না দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি শুধু কৈলবারার নহে, নিকটস্থ রাজ্যসমূহের সংবাদ তন্ন তন্ন ভাবে রাখিতেন। এইজন্যই তিনি মিবাররাজ্য ও কৈলবারার মধ্য-স্থলেই বাসস্থানটি মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন।

শুধু শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বে নহে, সমাজনীতি ও রাজনীতিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী। মানবচরিত্র সম্বন্ধেও তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার এই সকল গুণে হামির শেষে এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, কোন কার্য্যে তিনি সন্ন্যাসীর উপদেশ ব্যতীত কখন ব্রতী হইতেন না। এই উপদেশগ্রহণের শুভফলও তিনি হাতে হাতে পাইতেন। সন্ন্যাসীর আর একটু বিশেষত্ব ছিল, তিনি কাহাকেও মন্ত্রশিষ্য করিতেন না। তাহা না করিলেও, সকলেই তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিত এবং অনেকে গুরু বলিয়া সম্ভাষণই করিত।

তাঁহার প্রতি হামিরের ভাব ভক্তি ও সখ্যে মিশ্রিত। তিনি হামিরের শুধু সুবিবেচক উপদেষ্টাই নহেন, একজন যথার্থ মঙ্গলকামী বন্ধুও বটেন। হামির তাঁহার অবসরকালটা কখন রাষ্ট্রগত মন্ত্রণা, কখন বা নানাবিধ আলাপে সন্ন্যাসীর সংসর্গে কাটাইতেন। ভৈরবী যে রাত্রি কারাদর্শনে গিয়াছিল, তাহারই অবসানকালে হামির ও সন্ন্যাসী আশ্রমে বসিয়া আছেন। অন্ধকারের মধ্য হইতে ক্রমে চারিদিকে প্রকৃতির নবসৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। সে সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে হামির যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীও সেই নবকিরণপাতে সমুজ্জ্বল ভুবনের মহিমার দিকে তাকাইয়া আছেন। হামির মৃদুস্বরে সহসা যেন আবিষ্টবৎ বলিয়া উঠিলেন,—"জীবন যদি শুধু এই প্রভাতের হাসি দিয়াই গড়া হইত!"

সন্ন্যাসীর কর্ণে তাহা পৌঁছিল। তিনি বলিলেন, "তবে তাহাকে জীবনই বলা যাইত না।"

হামির এবার সন্ন্যাসীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এই মৃদু আলোক, এই কোমল গগন, এই শান্ত পবন, এগুলা কি নিতান্ত অকেজো উপকরণ?"

সন্ন্যাসী। যদি ইহাদের পশ্চাতে উদ্দেশ্য না থাকে তো অকেজো বৈ কি?

হামির। উদ্দেশ্য তো একটা বোঝার মত জীবনের স্কন্ধে বসিয়া রহে। ঐ বোঝা নামাইয়া লইলে কি বাহকের অস্তিত্ব থাকে না?

সন্ন্যাসী। মনে কর, একটা শিশিতে বাষ্প পোরা আছে। ছিপি খুলিয়া লইলে কি হয়?

হাম্মির। অবশ্য বাষ্প উড়িয়া যায়। তা গেলই, তাহাতেই বা বাষ্পের ক্ষতি কি?

সন্ন্যাসী। সেই আধারের ভিতর তাহার যে একটা আকৃতি ও গাঢ়তা ছিল, তাহা তো থাকে না। উদ্দেশ্যবিহীন হইলে, জীবনও একমুহূর্ত্তে ঐ মুক্ত বাষ্পের মত এলোমেলো হইয়া যায়। এরূপ দশা জীবনের পরিচায়ক নহে, ইহা মৃত্যুর আভাস। মোটকথা, তুমি যে জীবনের কল্পনা করিতেছ, তাহা জীবনের একটা অবস্থামাত্র। এই অবস্থার ক্রমবিকাশেই জীবন গড়িয়া উঠে। এই যে বর্ত্তমান প্রভাত ইহাও কালের একটা অবস্থা। জাগতিক অনন্ত পরিবর্ত্তনের সহিত জড়িতভাবে এই অবস্থা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়া অনন্ত দিবা ও রাত্রির সৃষ্টি করিবে।

সন্ন্যাসী একটু থামিয়া পরে হাসিয়া কহিলেন, "মহারাণার মনে এ আকস্মিক নির্ব্বেদের ভাব আসিল কেন? যাহা হউক ইহাকে বেশী গাঢ় হইতে না দেওয়াই উচিত। আমার ন্যায় সামান্য লোকের উপদেশের বল অতি তুচ্ছ। কর্ম্মপরাঙ্মুখ বীরের ঔদাস্য ভাঙ্গিতে চক্রপাণির মত শক্তি এ দীন কোথা পাইবে?"

হাম্মিরও সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ব্যাধিগ্রস্তের তুলনায় বর্ত্তমান বৈদ্য চক্রপাণি অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কোথায় মহেষ্বাস কিরীটী আর কোথায় সামান্য পৃথিবীর কীট। তদ্ভিন্ন আশঙ্কারও কিছু হেতু নাই। প্রান্তর মধ্যে ঝটিকাতাড়িত পথিক যেমন দূরস্থ আশ্রয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আমার বিরামের ইচ্ছাটাও সেইরূপ। সে জানে, প্রান্তর অতিক্রম না করিয়া

আশ্রয়ে যাওয়া যায় না, তথাপি তাহার নয়নে আশ্রয়ের সুখ ও বিরামের মূর্ত্তি কি জাগিয়া উঠে না?"

শেষে একটু হতাশস্বরে আরো বলিলেন, "সত্যই গুরুদেব, এ জীবনটা কেবল ঝঞ্ঝা আর বজ্রপাতেই পূর্ণ।"

সন্ন্যাসী। গন্তব্য এক হইলেও, পথ সকলের সমান হয় না।

হামির। বোধ হয় এ জীবনটা পথেই কাটিয়া যাইবে। গন্তব্যস্থানে আর পৌঁছান যাইবে না।

সন্ন্যাসী। ভগবান না করুন, কিন্তু তাহাই যদি হয় তবু জীবনের ব্রত অপালিত রহিবে না।"

হামির ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তবে পুরুষানুক্রমে কি রক্ত-পাত ও অশান্তিকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে?"

সন্ন্যাসী ধীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মনে কর, সেই ঝটিকায় ঘেরা যাত্রী কোন মূল্যবান জিনিষের বাহক। সে উহা প্রান্তর হইতে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিতে চায়, যদি সে পদে পদে বাধা খাইয়াও অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু আশ্রয়ে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার শরীর একেবারে শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তবে তাহার অনুবর্ত্তী সঙ্গীরা অবশ্য তাহা গ্রহণ করিবে; এবং নিজেদের শক্তি অনুসারে তাহা গন্তব্যের দিকে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইবে। দূরে নিক্ষিপ্ত চিতোরের মহিমার তুমিই অধুনা বাহক। পুনরায় তাহা চিতোরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার, ভালই, আর যদি পথেই সমস্ত বল ব্যয়িত হইয়া যায়, অন্য কেহ অবশ্য তাহা স্কন্ধে লইবে। যদি কেহ না লয়, ইহাই নিশ্চয় যে হামিরের সহিত রাজপুত জাতিও মরিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে এতটা ভাবিবার কিছু কথা নাই।

আশা ও উৎসাহে বুক বাঁধিয়া কর্ম্মপথে চলিতে থাক, ক্লান্ত হইয়া স্তিমিতপ্রাণে কখন থামিও না। তোমার জীবনে যে এ ব্রতের উদ্যাপন হইবে না, তাহা দেখিতেছি না বরং উদ্যাপনের শুভ লক্ষণই চারিদিকে প্রকাশ পাইতেছে। তবুও যদি দৈবক্রমে তাহা না হয়, তাহাতেই বা ক্ষোভ কি, দুঃখ কি, অনুতাপ কি, সাধের জীবন বৃথা যাইল বলিয়া হা হুতাশই বা কেন! এরূপ ব্যর্থতাও যে সিদ্ধির সোপান।

হাম্বির। বুঝিয়াছি—শান্তি শুধু একটা মনের কল্পনা।

সন্ন্যাসী। কল্পনা নহে, ইহাকেও মনের অবস্থা বলিতে পার। বিরোধ ও সংঘর্ষের বিরামে যে শান্তি তাহা ইহধামে বড় দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু এ শান্তি—যদিও ইহা প্রার্থনীয়—বাহ্য বস্তুগত শান্তি। অন্তরের শান্তি বিরোধের মধ্যেও অপ্রাপ্য নহে। যে বক্তি নিজের কামনা ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া কি বিরোধে কি অবিরোধে, কি দুঃখে কি সুখে, কি ব্যর্থতায় কি সাফল্যে নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যায়, সে সেই শান্তি হইতে কখনই বিচ্যুত হয় না। বৎস, তুমিও তো এই পথ অবলম্বন করিয়াছ।

হাম্বির সন্ন্যাসীর উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য যেমন ভাবে অন্য সময়ে শুনিতেন, সে প্রকারে যেন এখন শুনিতেছিলেন না। শুধু বলিলেন, "গুরুদেব, আপনার দর্শিত পথ ত্যাগ করি নাই। এ জীবনে করিবও না। তবে দুর্ব্বলতাবশতঃ চক্ষু অনেক সময় সে পথ একটু ঝাপসা দেখে। আপনার আশীর্ব্বাদে তাহা শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।"

হাম্বির পূর্ব্বের ন্যায় এখনও একটু অন্যমনস্ক রহিলেন।

সন্ন্যাসী ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, চিন্তা অনেক সময় অযথা বাধা পাইলে বিঘ্ন-প্রতিহত প্রবাহবৎ আরো বলবান হইয়া উঠে। সন্ন্যাসী কার্য্যান্তরের ব্যপদেশে সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু সন্ন্যাসীর স্থান আর একজন আসিয়া পূর্ণ করিল। হামির চপলাকে সহোদরার মত দেখিতেন। চপলাও তাঁহার সম্মুখে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না। সে সহসা এই সময় হামিরের নিকট আবির্ভূত হইল। তাঁহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, "মহারাণা, আমি জ্যোতিষ জানি। আমার বিদ্যার একটু পরীক্ষা লইবেন ?"

সন্ন্যাসীর গম্ভীর উপদেশ অপেক্ষা এই বালিকার ক্রীড়াই যেন এখন ভাল লাগিল। হামির কহিলেন, "যাহার যে বিদ্যা নাই, সে কি তাহার পরীক্ষা লইতে পারে ? ঐ শাস্ত্রটায় আমি ভারি মূর্খ।"

চপলা। তাহা কেন ? আমি কি আপনার কাছে চন্দ্র-সূর্য্যের স্থান নির্ণয় করিতে যাইতেছি। সে বিষয়ে আমিও এই জানি যে, তাহারা দুই ভাই বড় ঝগড়াটে। একজন অপরকে দেখিতে পারে না। আমি শুধু আপনার মনের কথাই বলিতে পারি। আচ্ছা, আপনি কি ভাবিতেছেন বলিব ?

হামির স্মিতমুখে বলিলেন, "বেশ তো, পারিলে তোমাকেই রাজসভার বরাহমিহির করিয়া দেওয়া যাইবে।"

চপলা। আপনি কোন ফুলের বিষয় মনে করিতেছেন।

হামির। আন্দাজি মিলিয়াছে বটে। আচ্ছা, কি রং বল দেখি?

চপলা। লাল।

হামিরের উষ্ণীষে এখনও সেই অশোকের দলগুলি বাঁধা ছিল। সন্ন্যাসী চলিয়া যাইলে, তিনি একবার তাহা খুলিয়াছিলেন। ভাবিলেন, চপলা হয়তো দূর হইতে তাহা দেখিয়াছে। এবার ঠিক ঠকাইতে পারিবেন, এই ভাবিয়া বলিলেন,—"যে ফুল ভাবিতেছি, তাহা তোলা না গাছে আছে?"

চপলা। দুয়ের কিছুই নয়।

হামির। তবে কি?

চপলা। তাহা কাটিয়া ফেলা।

হামির। কি, ছুরিকা দিয়া?

চপলা। না, কোন নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে।

এবার হামির কিছু বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ফুটিয়াছিল?"

চপলা। কোন রাজপ্রাসাদের পাশে।

হামিরের বিস্ময় বাড়িতে লাগিল। জিজ্ঞাসিলেন, "কাটিয়া কোথায় পড়িল?"

চপলা। কোন রাজকন্যার পায়।

হামির। এখন কোথায়?

চপলা। কোন রাজার শিরে। তবে শেষটুকু গণনায় নয়, প্রায় প্রত্যক্ষ।

হামির বিস্ময় আর গোপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবন-নাটকের এই নূতন অঙ্কের বিষয়ে তিনি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কিছু বলেন নাই। সন্ন্যাসীও সেই জন্য তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। হামির ভাবিতে লাগিলেন, এই বালিকা কোথা হইতে জানিল! কহিলেন,—"চপলা, তুমি এ বিদ্যা কোথা শিখিলে?"

চপলা কহিল, "তাহা পরে বলিব। এখন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করুন।"

হামির জিজ্ঞাসিলেন "ভাল, এ রাজকন্যা এখন কি করিতেছেন?"

চপলা। রাজার আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন।

হামির। রাজা যদি না যান?

চপলা। তবে সেই ফুলের মত রাজকন্যাও শুকাইয়া যাইবেন।

হামির। রাজার জন্য তাঁহার এত মাথাব্যথা কিসে?

চপলা। রাজা রাজকন্যার সর্ব্বস্ব লুটিয়া আনিয়াছেন। এই দস্যুতার বিচারকও রাজা। রাজা যদি ন্যায়বিচারে তাহার মূল্য প্রত্যর্পণ না করেন, তবে রাজকন্যার মরণ ভিন্ন আর কি পথ আছে!

হামির। রাজার কি তবে দস্যুতাই ব্যবসায়?

চপলা। তিনি অনেক লোকের ধনরত্ন কাড়িয়া আনেন বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে লোকেরাই দোষী, তাহারা রাজার প্রাপ্য সহজে দেয় না। কিন্তু এস্থলে দেখিতেছি, রাজা একটি অবলাকে বিনা দোষে ভাসাইয়াছেন।

হামিরের চক্ষু ভিজিয়া আসিতেছিল। তিনি অনেক কষ্টে তাহা নিবারণ করিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন,—

"চপলা, এখন সব রহস্য ভাঙ্গিয়া বল। তোমাকে কে ইহা জানাইল?"

চপলা এখন সরলভাবে বলিল, "আমার একজন নূতন সখী।"

হামির। তিনি থাকেন কোথায়? পরিচয়ই বা কি?

চপলা। থাকেন চিতোরে। তিনি তথাকার রাজকন্যার সহচরী, নাম শান্তা।

হামির। শান্তার সহিত তোমার কোথায় দেখা হইল?

চপলা। রাজান্তঃপুরের বাগানে।

হামির সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে তুমি কখন কি জন্য গিয়াছিলে? তোমাকে কি শান্তা ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছিল?"

"না, পূর্ব্বে তো শান্তা আমাকে জানিত না।"

চপলা হামিরের প্রশ্নের এই উত্তর দিয়া পরে স্মিতমুখে পুনশ্চ কহিল, "কারণ এখন জানিতে চাহিবেন না। আমি নিজের দরকারে গিয়াছিলাম।"

হামির। তোমার পিতার জ্ঞাতসারে?

চপলা। প্রথমে আমি ও পাড়ার এক সখীর বাড়ী যাই। সেখান হইতেই রাজধানী গমন করি। গত রজনীতেই ফিরিয়াছি। বাবা কিছুই জানেন না।

হামির বালিকার চঞ্চল স্বভাব জানিতেন। ভাবিলেন, হয়তো চিতোরের রাজপ্রাসাদ দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায়, সখীর

বাড়ীর লোকেদের নগরে যাইতে দেখিয়া অমনি সেই সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। এবং সেখানে ঘটনাক্রমে শাস্তার সহিত দেখা ও পরিচয় হইয়াছে। হাম্মির এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

তাঁহার নিজের চিন্তাও আরো ঘনীভূত হইয়া আসিল। তিনি শান্তাকে এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাঠান নাই এবং কি করিয়া এ বিষয় মীমাংসিত করিবেন, তাহাও স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহার একটা সন্দেহ রহিল, রাজকুমারী কি তাঁহার পরিচয় চপলার যাইবার অগ্রেই পাইয়াছেন? তাঁহাকে পিতৃশত্রু জানিয়াও কি রাজকুমারী কিছু ক্ষুব্ধ হন নাই? হাম্মির পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—

"সেই রাজকন্যা কি রাজাকে চিনিয়াও তাহার প্রতি অনুরক্ত আছেন?"

চপলা। সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিলেও, পদ্মিনী তাহাকে চিনিতে পারে। সূর্য্যের প্রখর কিরণ বাহির হইলেও, পদ্মিনী সমভাবেই তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। এ অবধি সকল প্রশ্নেই তবে আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি? এক্ষণে মহারাণার সম্পর্কেও কিছু ভবিষ্যৎ বলি। মহারাণার জীবনে শীঘ্রই একটা নূতন ব্যাপার ঘটিবে।"

হাম্মির। হাতে যতদিন তরবারি আছে, ততদিন নিত্য নূতন ব্যাপারের অভাব হইবে না।

চপলা। না মহারাণা, এ কাটাকাটি নহে, এ গ্রন্থিবন্ধন।

হাম্মির। বাঁধিবে কে?

চপলা। একটি ছোটখাট পাখাওয়ালা সুন্দর প্রাণী।

হামির হাসিয়া কহিলেন, "অসম্ভব! এত বড় বীরটাকে একটা নগণ্য প্রাণী কায়দা করিবে?"

চপলা। সম্ভবতঃ ফুলের তাজা মধু খাইয়া ছোট হইলেও তাহার ভারি জোর। যাহা হউক, শীঘ্রই তাহার চর আসিয়া হাজির হইবে। তাহাকে বিদায় দিবার আগে চপলা যেন একটু খবর পায়।

চপলা এই পর্য্যন্ত বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল। হামিরের আর কিছু তখন জানিবার অবসর রহিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যথার্থই সন্ন্যাসীর আশ্রমে কিয়ৎক্ষণ পরে এক মহা গণ্ডগোল বাঁধিয়া গেল। হামির কোন রাষ্ট্রনীতিক পরামর্শের জন্য সমাগত কয়েকজন সামন্তের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার এক পরিচারক এক দূতবেশী লোককে সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। এ আবার সাধারণ দূত নহে, ইহার হাতে এক নারিকেল ফল। দেশের প্রথানুসারে বিবাহোপলক্ষে প্রেরিত দূতই এই ফল লইয়া আসিত। বর্ত্তমান দূত চিতোরের শাসনকর্ত্তা মালদেবের নিকট হইতে আসিয়াছিল। সে পরিণয়-দেবতা প্রজাপতির চিহ্নস্বরূপ সেই ফল হামিরের পুরোভাগে রাখিয়া তাহার সন্দেশ জ্ঞাপন করিল। মালদেব তাঁহার কন্যাকে হামিরের হস্তে সম্প্রদান করিতে চাহেন।

এই সংবাদে প্রায় উপস্থিত সকলে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। ক্রুর শত্রু মালদেবের এ আবার কি চক্র। যাহাকে আয়ত্তে পাইলে হাতে মাথাটা কাটিয়া ফেলেন, তাহাকে জামাতৃপদে বরণ! যাহারা উৎপীড়নে প্রায় কণ্ঠাগত-প্রাণ, তাহার প্রতি শুধু অনুকম্পা নহে, এত প্রবল স্নেহপ্রদর্শন! এ রহস্যের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটনে কেহই সমর্থ হইলেন না। শুধু এই সন্দেহই জাগিল যে, এ একটা হামিরকে পাকড়াইবার ফন্দী। অবশ্য এরূপ দূত-প্রেরণ একটা খুব পবিত্র প্রথা। এমন করিয়া ইহার অপব্যবহার কেহ করে না, কিন্তু ধর্ম্ম-বর্জ্জিত স্বার্থলুব্ধ মালদেবের পক্ষে এরূপ ছলনাও সম্ভবপর বলিয়াই অনেকের প্রতীতি জন্মিল। সামন্তগণ সকলেই একবাক্যে এ মিথ্যা প্রস্তাব স্বীকার করিতে নিষেধ করিলেম।

হামির কিন্তু এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করা রাজপুতোচিত নহে, বাহ্যতঃ এইরূপ কারণ দেখাইয়া ইহার অনুমোদনে দার্ঢ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভিতরে অবশ্য যে দৃঢ়তর কারণান্তর বর্ত্তমান ছিল, সামন্তগণ তাহা জানিতেন না। সহসা কোন নির্দ্ধারণ না হওয়ায়, দূতকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইল এবং তাহার বিশ্রামের পর তাহাকে এ বিষয়ে জানান হইবে, এইরূপ স্থির হইয়া গেল। হামিরের বিপদাশঙ্কা করিয়া তাঁহার সামন্তগণ তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহারা নিজে নিজে না পারিয়া সন্ন্যাসীকে ধরিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সন্ন্যাসী এমন বিচক্ষণ ও সতর্ক লোক হইয়াও হামিরের কথাতেই

মত দিলেন। সামন্তগণ এবারে বড়ই বিস্মিত হইলেন, এবং ইহার মধ্যে তাঁহাদের অজ্ঞাতব্য কোন রহস্যই বা গুপ্ত আছে, এই ভাবিয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন। কিছু পরে সন্ন্যাসীও স্থানান্তরে যাইলেন। এইবার পূর্ব্ব ইঙ্গিতানুসারে হাম্বির চপলাকে ডাকিলেন। চপলা আসিয়াই বলিল,—

"এখন গণকের প্রাপ্যটা দিন।"

হাম্বির সহাস্যে কহিলেন, "তুমি এক পক্ষের গণক, অপর পক্ষের ঘটক। তোমার দেখিতেছি, দুনো দুনি লাভ।"

চপলা। এমন লাভ না থাকিলে কি আর এ কাজে হাত দি। এখন যৌতুকের বিষয় কি স্থির করিলেন?

হাম্বির। সে কি আর বর নিজে স্থির করে, তাহার আত্মীয়েরাই তাহা করিয়া থাকে। এখন তেমন আত্মীয়ের মধ্যে তুমিই তো এক বোন আছ। রাজা হইলে মন্ত্রীরাও ইহা ঠিক করে, কিন্তু এ বিষয়ে তোমার অপেক্ষা বিজ্ঞ মন্ত্রণাদাতাও আর তো বড় দেখিতেছি না। এটা তোমারই কাজ।

চপলা। ভাল তাহাই হউক। কিন্তু ইহার পরে দেখিবেন, যেন ঠকা মনে না করেন কিংবা ছেলেমানষি বলিয়া উড়াইয়াও না দেন।

হাম্বির। যদি ঠকিতে হয়, এইরূপ স্নেহশীলা আত্মীয়া এবং এইরূপ পাকা মন্ত্রীর হাত দিয়াই ঠকা ভাল। স্বার্থপর বা বোকা লোকের হাতে এ ভার দেওয়া হইয়াছে, এ কথা তো কেহ বলিতে পারিবে না।

চপলা মৃদুহাস্যে কহিল, "বোকা না হইলেও, আমাকে

নিতান্ত নিঃস্বার্থ নাও ভাবিতে পারেন। আমি কি চাহিব, এ বিষয়ে আপনার কি মনে হয়?"

হামির। পূর্ব্বে হইলে মনে করিতাম, দুই চারিটা ফুলগাছ, কতকগুলা পুতুল, হয়তো তার সঙ্গে একটা পোষা পাখীও। কিন্তু এই প্রভাত হইতে তোমার সম্বন্ধে আমার মতামত ভারি উলট পালট হইয়া গিয়াছে। এখন কি একটা রাজ্য চাহিয়া বসিবে নাকি?

চপলা। পোষা পাখী না হইয়া যদি পোষা মানুষ হয়, রাজ্য না হইয়া যদি একজন রাজপুত্রই হয়?

হামির সহাস্যেই চপলার কথার উত্তর দিতেছিলেন। এবার কিছু বিস্মিত ও কিছু গম্ভীরভাবে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন,—"তবে বুঝি আগেকার মতটাকেই ফিরাইয়া আনিলে?"

চপলা। কেন, এরূপ জিনিব চাওয়া কি নিতান্ত চপলতা?

হামির। চাওয়া দূরে থাকুক, কাজের সময় এরূপ বকাটাও যে তাহাই বটে।

চপলা একটু বিমর্ষভাব দেখাইয়া বলিল, "আপনি তবে আমাকে মিথ্যা কল্পনাকারিণী মনে করিতেছেন? না মহারাণা, সত্যই আমি উহাই চাহিব। আপনার ইহাতে কি সম্মতি নাই?"

হামির অত্যন্ত কৌতূহলী হইলেন। বলিলেন, "বলিয়া যাও, আমার সম্মতির অপেক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে তোমার আজ অপ্রতিহত অধিকার।"

চপলা। মহারাণা, জলধরকে যৌতুক চাহুন।

হামির। জলধর তো আমারি, আমার জিনিষ আমি আবার চাহিব কি?

চপলা। আপনার জিনিষ হইলেও, তাহা পরের হাতে গিয়া পড়িয়াছে।

হামির এবার একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "চপলা, তুমি ভুল শুনিয়াছ। জলধর পরের হাতে যাইবার মত লোক নয়। তুমি কি কাহারও প্ররোচনায় বিশ্বাস করিয়াছ যে, সে মালদেবের সঙ্গে যোগ দিয়াছে? তাই তাহাকে চাহিয়া লইয়া শাস্তি দিতে হইবে?"

চপলা। শাস্তি নয় মহারাণা, মুক্তি দিতে হইবে। জলধর এখন বন্দী।

দারুণ সত্য হামিরের অন্তরে এবার যেন একটু প্রতিভাত হইল। তিনি বিস্ফারিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?"

চপলা। সন্দেহ করিয়া হরিসিংহ তাঁহাকে প্রাসাদের কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছে।

একটু চিন্তা করিয়া হামির কহিলেন, "কোথা জানিলে?"

চপলা। নিজেই দেখিলাম।

হামির দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তবে আর এখন বরসজ্জায় কাজ নাই। একেবারে রণসজ্জাতেই যাওয়া বিধেয়। পত্নী ও বন্ধু দুয়েরই এক সঙ্গে উদ্ধার করিয়া আসা যাইবে।"

চপলা পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবেই বলিল, "আমি বলি, সহজ উপায় যখন রহিয়াছে, তখন সুভদ্রাহরণের পালাটা এখন থাক।"

হামির। যদি তাহারা সে কথায় রাজি না হয়?

চপলা। অন্য পথ তখনও খোলা থাকিবে।

এবার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া হামির ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাকে যখন আজ অপ্রতিহত মন্ত্রিত্ব দিয়াছি, তখন তোমার দ্বারাই আজ চালিত হওয়া উচিত।"

এইখানে দুই একটা কথা বলিয়া রাখাই ভাল। হামির যে জলধরকে সাতদিন পরে আসিতে বলিয়াছিলেন তাহা চপলা জানিত না। সেই রাত্রির সাক্ষাতের পর হইতে জলধরকে আর তাহাদের আশ্রমে আসিতে না দেখিয়া চপলার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত সখীর কোনরূপ সাহায্যে সে ভৈরবী-বেশে চিতোরে যাত্রা করিল। চপলা অশ্বারোহণে সুদক্ষা ছিল। কৈলবারার প্রান্তস্থ সন্ন্যাসীর আশ্রমও চিতোর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। সুতরাং চপলার চিতোরে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে বেশী বিলম্বও হয় নাই।

জলধরকে অতর্কিতভাবে কিছু গোপনেই বন্দী করা হইয়াছিল। চপলা চিতোরে আসিয়া জলধরের সম্বন্ধে যদিও প্রথমে কোন নিশ্চিত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তথাপি যাহা কিছু পারিল, তাহাতেই নিজের একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। পরে সেই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিতে করিতে ক্রমে স্থির নিশ্চয়ে পৌঁছিল। চপলা ভৈরবী-বেশে চিতোরে আসিয়া যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

আর এক কথা—সামন্তগণ বাধা দিলেও সন্ন্যাসী কেন

অবাধে হামিরের মত সমর্থন করিলেন? ইহার হেতু চপলা হামিরের নিকট হইতে যাইয়াই পিতাকে সমস্ত বলিয়া, বুঝাইয়া, গড়িয়া রাখিয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাহের দিনক্ষণ সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। হামিরের মনস্তুষ্টির জন্য মালদেব অগ্রেই জলধরকে ছাড়িয়া দিলেন। শুভলগ্নে মহা আড়ম্বরে হামির বরসজ্জায় কৈলবারা হইতে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য সহযাত্রী ভিন্ন প্রায় পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈন্যও তাঁহার সঙ্গে চলিল। কিন্তু তিনি যখন সদলে চিতোরে প্রবেশ করিলেন, মালদেবের পক্ষ হইতে কোন সমারোহই দেখিতে পাইলেন না। এমন কি বিবাহে একান্ত আবশ্যক যে মঙ্গলতোরণ তাহা অবধি নির্ম্মিত হয় নাই।

বিবাহসময়ে কন্যাপক্ষীয়দিগের এই তোরণরচনা রাজপুতের এক চিরাগত রীতি। কন্যার গৃহে প্রবেশোন্মুখ বরের উপর কন্যাপক্ষীয়া সুন্দরীরা এই তোরণের নিকট হইতে আবিরাদি নিক্ষেপ করিতেন। পরে যখন এইরূপ আক্রান্ত বর ভল্ল দ্বারা তোরণ বিভগ্ন করিয়া ফেলিতেন, তখন রমণীগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চলিয়া যাইতেন। হামির কেন যে এই তোরণের দর্শন ও তৎসহ কমলনিক্ষিপ্ত পরাগের মত কোমল বর্ষণ হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাহার কারণ তখন বড় মিলিল না।

ক্রমে বরের দল রাজবাড়ীতে আসিল। পথের ন্যায় এখানেও তেমন কিছু সাজসজ্জা নাই, তবে মালদেব এবং তাঁহার পুত্রেরা সকলকেই যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। বর প্রাসাদমধ্যে নীত হইয়া দেখিলেন, চারিদিক প্রায় নীরব ও নিস্তব্ধ। শঙ্খের তেমন নিনাদ নাই, অলঙ্কারের তেমন শিঞ্জিত নাই, রূপের ঝলকে কিংবা দীপের আলোকে সেস্থান বিবাহের উপযোগিরূপে আলোকিত নাই। তাঁহার মনে হইল, মালদেব যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় মহা দায়ে পড়িয়া এই বিবাহ দিতেছেন। যাহা হউক, অন্যান্য আয়োজনের ত্রুটি থাকিলেও, শিবানী বধূবেশে যথাকালে আনীতা হইলেন। পুরোহিত যথারীতি তাঁহাদের বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

ইহার পর সে রাত্রি বরকন্যার একত্র থাকিবারই ব্যবস্থা, কিন্তু কোথায় বা বাসর আর কোথায় বা বাসরশোভিনীরা, কোথায় বা আমোদ আর কোথায় বা আমোদকারিণীরা! হামিরকে একা অসহায়ভাবেই এক নিভৃত কক্ষে সে বিবাহ-রজনী যাপন করিতে হইল। তাঁহার অন্তরস্থ চিন্তার সংসর্গই বাহিরের উল্লাস ও আনন্দের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। শিবানীর কোষ্ঠী অনুসারে এইরূপেই তাঁহার উদ্বাহকার্য্য সম্পাদ্য, ইহা হামিরকে জানান হইলেও, তিনি এ কথায় যেন ততটা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। কি যেন একটা খটকা তাহার মনে লাগিয়া রহিল। কিন্তু অনেক চিন্তাতেও মালদেবের এইরূপ আচরণের একটা মনোমত সূত্রও বাহির করিতে তিনি অক্ষম হইলেন। ক্রমে তাঁহার চিন্তার প্রবাহও অপর দিকে ফিরিল।

আজ তিনি কোথায়? অতীত অথচ অম্লান গৌরবপূর্ণ পিতৃপুরুষদিগের সদনে। আজ তিনি সেখানে কি বেশে? শুধু একজন অতিথিমাত্র, তাঁহার আপনার বলিবার এক কপর্দ্দকও সে স্থানে নাই। পিতামহ, পিতা, খুল্লতাত, আত্মীয় পরিজনবর্গের কল্পিত মূর্ত্তিতে যেন হাম্বিরের নয়নে সহসা সে স্থান ভরিয়া উঠিল। তিনি অর্দ্ধ জাগ্রৎ, অর্দ্ধ সুপ্তিতে দেখিলেন, কত বীরের গাত্র হইতে অজস্র শোণিত-ধারা বহিতেছে। দেখিলেন, ঐ ভীমসিংহের অসি ঘুরিতেছে, আর তাহা হইতে রক্তের বৃষ্টি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ লক্ষ্মণসিংহ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন, তাহার প্রতিধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিতেছে। ঐ গোরা মদস্রাবী মাতঙ্গের মত ছুটিতেছেন, তাঁহার পদতলে অসংখ্য শত্রুসেনা পেষিত হইয়া যাইতেছে। আবার তৎসঙ্গে ঐ অদম্য করভের কি উদ্দাম তাণ্ডব! নাচিয়া খেলিয়া ছুটিতেছে আর অবলীলায় শত্রুসেনা যেন আকাশপথে ছুড়িয়া ফেলিতেছে আর লুফিতেছে। কে উটি? এ সেই বীর বালক বাদল। কিন্তু একি হইল! রক্তে রক্তে যে পথ, প্রান্তর ভরিয়া উঠিল। ক্রমে রক্তের নদী বহিল ও তাহাতে রক্তের বান ডাকিল। সব ডুবিয়া গেল। কেবল সেই স্রোতের এখানে সেখানে কতকগুলা শস্ত্রপাণির বিজয়গর্ব্বিত রুক্ষমূর্ত্তি মাঝে মাঝে প্রতিফলিত হইতেছে। কেবল দূরে দূরে এক একটা অনলের শিখা কত ললিত নারীমূর্ত্তি বেড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। মর্ত্তের এত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আস্বাদে সেই অগ্নিশিখা যেন আরো ক্ষুধাতুর হইয়া গ্রহতারকা, চন্দ্র, সূর্য্য গিলিবার জন্য গগনমার্গে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই চিন্তায় ও স্বপ্নেই হাম্বিরের সে বাসররজনী প্রায় কাটিল। স্বপ্নের শেষভাগে ঐ ভীষণ দৃশ্যটাও অন্তর্হিত হইল। হাম্বির আবার যেন রাজপ্রাসাদের সোনার চূড়ায় চিতোরলক্ষ্মীকে সমাসীনা দেখিলেন। কমলার আবির্ভাবে আবার যেন দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বল, শ্যামল ও কোমল হইয়া উঠিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে হাম্বিরের স্বপ্ন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। এখন ঐ কক্ষমধ্যে দূরে দাঁড়াইয়া ও কে? এ কি সেই বর্ষাস্নাতা প্রফুল্ল ব্রততী? সেই কূলপ্লাবিনী শ্রাবণের তরঙ্গিণী? সেই শারদ গগনের পূর্ণিমারূপিণী? কিন্তু তাহার সে চিত্তহারী লাবণ্য কৈ? সে উচ্ছ্বাসময় তরঙ্গ কৈ? সে সর্ব্বতোব্যাপিনী দ্যুতি কৈ? কে যেন এখন সেই লতার মূল কাটিয়াছে। দারুণ নিদাঘে সেই ভরা নদী শুকাইয়াছে। করাল রাহু সেই পূর্ণিমা গ্রাস করিয়াছে।

সত্যই এই কি সেই নবপরিণীতা বধূ? সত্যই কি এ সেই আনন্দময়ী প্রতিমা যাহা প্রদোষে বিবাহবেদিকা আলোকিত করিয়াছিল? আর উষায় তাহার এ কি দশা! ঐ আকাশের শশাঙ্কের মত তাহারও বধূরূপ কি কেবলমাত্র নিশাব্যাপী? বিলীনপ্রায় চন্দ্র নিতান্ত পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। সেই বধূ-মূর্ত্তির উপরেও যেন মৃত্যুর ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার চক্ষে সে জ্যোতি নাই, অধরে সে হাসি নাই, দেহে সে

কান্তি নাই। তাহার অঙ্গে এখনও বধূর বেশ রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যেন বিশুষ্ক ফুলের পাশে চিত্রিত পত্র। সে পত্রেরও তেমন আর পারিপাট্য নাই।

শিবানী যেন কতক্ষণ ধরিয়া ভূমিতলে ধূলায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সুচিক্কণ সুবাসিত কবরীবদ্ধ কেশদাম খুলিয়া, এলাইয়া, ধূলিমাখা হইয়া কতক অংসে, কতক পৃষ্ঠে, কতক বক্ষে মূর্ত্তিমান শোকের মত শিবানীকে ঘেরিয়া পড়িয়া আছে। ভূষণগুলাও কোনটা ভগ্ন, কোনটা অর্দ্ধভগ্নভাবে বিসর্জ্জনান্তে প্রতিমায় সংলগ্ন রাঙ্গের মত শরীরে লাগিয়া রহিয়াছে। শিবানীর সেই মূর্ত্তি দেখিয়া হামির বিস্ময়ে, দুঃখে, আশঙ্কায়, উচ্ছ্বাসে বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু শিবানী কঠোর ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। কহিলেন,—

"স্বামিন্"—একটু থামিয়া যেন নিজের মনকে বুঝাইয়া আবার বলিলেন, "আমি তোমার পত্নী না হইলেও, তুমি তো আমার স্বামী।"

হামির শিবানীর ইঙ্গিতে ও বাক্যে অধিকতর বিস্মিত ও ভীত হইলেন, শিবানী কি এইরূপ সাময়িক উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন! হামির সস্নেহে বলিলেন, "সে কি শিবানি, গত রাত্রেই যে তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হইয়াছ। এখন চল, আমার গৃহ আলোকিত করিবে।"

হামির এবারও অগ্রসর হইতে গিয়া পূর্ব্ববৎ বাধা প্রাপ্ত হইলেন। শিবানী কহিলেন,—"যে লক্ষ্মীর আবরণে এতক্ষণ ঢাকা ছিলাম, তাহা অপসারিত হইয়াছে। এখন আমি পিশাচীবৎ অস্পৃশ্যা।"

হাম্বির সাবেগে কহিলেন, "না—না তুমি আমার মন্ত্রপূত দেবীমূর্ত্তি। এই যে কিছু পূর্ব্বে পুরোহিত মন্ত্র পড়িলেন। ইহা তো মিথ্যা নহে। শিবানি, তুমি এত বিস্মৃত হইতেছ কেন ?"

শিবানী। মন্ত্র মিথ্যা নহে, পুরোহিত মিথ্যা নহে, কিন্তু আমি যে মিথ্যা।

হাম্বির। সত্য মিথ্যা নিজের অনুভূতির উপর। আমার হৃদয় তোমাকে বেড়িয়া রহিয়াছে। প্রতি পলে সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছে। তুমি কি কখন মিথ্যা হইতে পার ? কাছে এস, শিবানি।

শিবানী এবার কিছু কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"আমি দীনা ভিখারিণী, আমি রাজার পাশে কোনমুখে দাঁড়াইব। কিন্তু ভিখারিণীরও হৃদয় আছে। তাহা যদি সে রাজার পদে দিয়া থাকে, রাজা কি তাহা ঘৃণায় দলিয়া যাইবেন ?"

হাম্বিরও ব্যথিতস্বরে কহিলেন, "শিবানি, রাজার বক্ষের মাণিক তুমি, এস, শিবানি, তোমার নিজের স্থান অধিকার কর।"

শিবানী কাতরস্বরে বলিলেন, "প্রিয়তম, স্বর্গ হইতেও ঐ স্থান আমার অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এমন লোভের জিনিষ দিয়া আর দুর্ব্বলা নারীকে ভুলাইও না।"

তৎপরে সংযতভাবে আবার বলিলেন, "রাজা যখন তাহার সত্য রূপ দেখিবেন, তখন সে মাণিকের স্থানে কেবল বিষধরীর ফণাই তাঁহার নয়নে পড়িবে।"

হাম্বির। তোমার যে রূপ দেখিয়াছি, তাহাতেই অমৃতের

স্বাদ পাইয়াছি। আর কোন রূপ দেখিতে চাহি না। শিবানি, তুমি কি এলোমেলো বকিতেছ না?

শিবানী। মহারাণা আমাকে যাহা ভাবিতেছেন, আমি তাহা নহি। সেরূপ হওয়াও ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয় ছিল। আমার মন ঠিক প্রকৃতিস্থই আছে, আমিই কেবল বিকৃত।"

হামির দেখিলেন, ইহা তো উন্মাদের মত কথা নহে। তিনি মহা সমস্যার পাথারে পড়িলেন, কোন দিকে তাহার যেন কূল কিনারা নাই। শিবানী তাঁহাকে বিষণ্ণ ও নীরব দেখিয়া বলিলেন, "আর তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিতেছি কেন। তবু আত্মপরিচয় দিতে রসনা যেন জড়াইয়া আসিতেছে। তোমার নয়ন হইতে কত স্নেহ, কত করুণা ঐ যে এখনও আমার উপর আসিয়া পড়িতেছে। উহা যে ইন্দ্রজালের মত আমাকে বাঁধিতেছে। জানি, এখনই উহা ছিঁড়িতে হইবে, তবু ছিঁড়িবার শক্তি যে পাইতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে, আরো একটু উহা আমাকে ঘেরিয়া থাকুক, আরো একটু উহার স্পর্শ অনুভব করি। এ জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আর আসিবে না। স্বামিন্—একবার, শুধু একবার মুক্তকণ্ঠে আমাকে ডাকিতে দাও। ঐ সম্ভাষণ এই কণ্ঠের পক্ষে বড়ই নবীন, মধুর ও রসপূর্ণ। কিন্তু দিয়াই এমন জিনিষ কে কাড়িয়া লইল। এক বৎসর, এক মাস, এক পক্ষ, এক দিনও রসনার অধিকারে তাহা রহিল না।"

শিবানী যুক্তকরে ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যদি এমন করিয়া কাড়িবে, তবে দিলে কেন বিধাতা! কাঙ্গালিনীর

হাতে রত্ন দিয়া ছিনাইয়া লওয়াই কি মহতের কাজ? ঊর্দ্ধে তুলিলে, কি কেবল সেখান হইতে ফেলিয়া দিয়া রঙ্গ দেখিতে? শুধু ভাঙ্গিতেই কি বড় করিলে? শুধু বজ্রে পোড়াইতেই কি তরু নব পুষ্পপত্রে মুঞ্জরিত করিলে? শুধু জীবন লইতেই কি জীবনের মূল্য দেখাইলে? জানি না একি দৈবীলীলা!"

শেষে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে ধীরস্বরে কহিলেন,—"দেবতা, অজ্ঞানের অপরাধ লইও না। তোমার খেলা কে বুঝিবে!"

হামির এতক্ষণ নিশ্চল পাষাণের ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই কাতরোক্তি শুনিতেছিলেন। শিবানীর প্রতি কথা তাঁহার বুকে শেলের মত লাগিতেছিল। শেষে আর নীরব থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"শিবানি, আমার প্রতি তোমার কি একটুও করুণা নাই? এই কি প্রথম মিলনের আলাপ?"

শিবানী পলকহীন লোচনে কিয়ৎক্ষণ হামিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এবার অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন,—

"প্রভু, এ মিলন নহে, এ চিরবিদায়। আমাদের বিবাহ আচারবিরুদ্ধ। আমি বিধবা।"

হামিরের মর্ম্মে যেন তপ্ত লৌহশলাকা বিঁধিল। তিনি একটু টলিয়া পার্শ্বস্থ খাটের দণ্ড ধরিলেন। শিবানী কহিলেন,—"কিন্তু দাসীর কথা বিশ্বাস করিবেন, সে নিজেকে এরূপ জানিয়া আপনাকে প্রতারিত করে নাই।"

হামির ক্ষুব্ধ ও বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে শিবানীর প্রতি চাহিলেন। শিবানী বলিলেন,—"তবে শুনুন। যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা কেবল আজ এই বিবাহের পর জানিতে পারিলাম। আমার জন্মিবার পূর্ব্বে আমার কয়েকটি সহোদরা অতি অল্প

বয়সেই মারা যায়। ভিন্নকুলস্থা করিলে কন্যাটি বাঁচিতে পারে, এই সংস্কারে আমার বয়স বৎসরাধিক না হইতেই মাতার একান্ত আগ্রহে পিতা আমাকে কোন ভট্টিবংশীয় রাজকুমারের সহিত বিবাহবদ্ধ করেন। কিন্তু এই বিবাহের বৎসর না ফরিতেই সেই রাজকুমারের পরলোকগমন হয়। এ বিবাহ আমাদের পূর্ব্বকার গৃহে হইয়াছিল এবং তাহাতে কোন সমারোহও করা হয় নাই। নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন কেহ বড় এ কথা জানিত না। যাহারা জানিত, তাহারা কেহই আমার কাছে কখন ইহার উল্লেখ করে নাই। কেন যে এরূপ বিবাহপ্রস্তাব পিতা আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, ইহার কারণ আর বলা বাহুল্য। কিন্তু পিতার ইচ্ছা যাহাই হউক, কন্যা আপনার নাম কলঙ্কমুক্ত রাখিবে। বিবাহের নিদর্শন লুপ্ত হইলে, লোকে ইহার কথা আর ধরিবে না। অন্ততঃ কিছু পরেই ইহার আলোচনা মন্দীভূত হইয়া যাইবে। সময়ে আপনার ক্ষতি পূর্ণ হইবে। আর এ বিবাহ অস্বীকার করিলেই বা কয়জন আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। এখন দাসী বিদায় লইতে আসিয়াছে, একবার প্রসন্নমুখে তাহার দিকে ফিরিয়া দেখুন। যদি তাহা না পারেন, অন্ততঃ ঘৃণা বা সন্দেহ সহকারে তাহাকে বিদায় দিবেন না। সে আর কোন দিন এ জীবনে আপনার নিকট পত্নীত্বের দাবী করিতে আসিবে না। তবে পরকাল আছে, তাহার আশা সে ছাড়িবে কেন।”

শিবানীর দৃঢ়স্বর এইবার কিছু বিচলিত হইয়া পড়িল। শিবানী বলিতে লাগিলেন,—“জীবনের এইটুকু ক্ষুদ্র অবসর।

একবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও। ওকি তোমার মুখে ও কিসের ছায়া? তোমার নয়নে ও কিসের দাগ? আহা, দারুণ বেদনায় ও মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। ও উজ্জ্বল প্রফুল্ল চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়াছে। প্রিয়তম, এ জীবনে তো কাছে যাইতে পারিব না, কেমন করিয়া মুছাইয়া দিব। না—না পারিব না; কখনই পারিব না। বিচারে তাহা নাই, ব্যবহারে তাহা নাই। যদি এ জীবনে না পারিলাম, আশীর্ব্বাদ কর, মাথার চরণধূলি দাও—না, না তাহাও স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু যদি জীবনের শেষে লুটাইয়া পড়ি, তখনও কি পায়ে ঠেলিবে? স্বামিন, হৃদয়েশ্বর, চলিলাম।"

হামির যেন এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। কেবল এক দৃষ্টিতে শিবানীর দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়াছিলেন। দেখিলেন, শিবানীর বিলম্বিত দক্ষিণ বাহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। অঙ্গুলিতে কি যেন বিদ্যুৎ চমকিল। সেই বিদ্যুৎ যেন শিবানীর অধর স্পর্শ করিতে গেল। হামির এবার উন্মত্তবৎ শিবানীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মুখের উপর হইতে শিবানীর হাত সরাইয়া সেই বিদ্যুতের স্থানে নিজের অধর স্থাপন করিলেন। হামিরের দৃঢ় আলিঙ্গনে শিবানীর অচেতন নিস্পন্দ দেহ, বাতাহতা পতনোন্মুখী বল্লরী সহসা তরুর শাখায় জড়াইয়া গেলে যেরূপ হয়, সেইরূপ ভাবে হামিরের বক্ষে সংলগ্ন রহিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর বৎসরাধিক চলিয়া গিয়াছে। সেই আকস্মিক বিপর্য্যয়ে যখন শিবানী একান্ত শূন্যচিত্তা ও অশরণা হইয়া পড়িলেন, তখন বিষস্রাবী অঙ্গুরীয় দ্বারা তিনি নিজের ভারবহ জীবনের অবসান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা শিবানীর রসনাস্পৃষ্ট হইবার অগ্রেই হামির কর্ত্তৃক দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। শিবানী যে মূর্চ্ছাগত হন, তাহা কেবল মানসিক উত্তেজনাবশতঃ। অল্প শুশ্রূষাতেই তাহা অপনোদিত হইল। হামির বিচেতনাকে যে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন, সচেতনার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইতে পারিলেন না। শত্রুকন্যাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে, এই বিরুদ্ধ যুক্তির সহিত তাঁহার নরজাত প্রেমের যে প্রথম সংঘর্ষ হয়, তাহাতে সেই প্রেম যেমন বলবত্তর হইয়াছিল, এ স্থলে তেমনই তাহা সামাজিক দুর্ভেদ্য অন্তরায়ের উপরেও নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিল।

বাস্তবিক রাজপুত বিধবাবিবাহকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এরূপ বিবাহ বংশগৌরবের নিতান্ত হানিকর। হরিসিংহের বর্ণনায় মালদেব বুঝিলেন, সম্ভবতঃ হামির ছদ্মবেশে কোন অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আসিয়া ঘটনাক্রমে শিবানীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। এখন তাঁহার নিকট বিবাহপ্রস্তাব পাঠাইলে, হামির তাহা অগ্রাহ্য না করিতে পারেন। মালদেব নিজের নাসিকা কাটিয়াও পরের যাত্রাভঙ্গ করিবার মত লোক। এরূপ বিধবা কন্যার বিবাহে তাঁহার নিজের সম্মানের হানি হউক, কিন্তু ইহাতে যে গর্ব্বিত রাণাবংশের অগৌরব ঘটিবে, ইহাই তাঁহার পরম লাভ। কিন্তু পশ্চাৎ জানিতে পারিয়া যদি হামির তাঁহার কন্যাকে ত্যাগ করেন, সে বড় কলঙ্কের কথা। সেইজন্য বিবাহের অব্যবহিত পরেই শিবানীকে তাঁহার বৈধব্য জ্ঞাপন করা হয়, যাহাতে শিবানী আগে হইতেই কাঁদিয়া কাটিয়া বুঝাইয়া যেন হামিরকে বশ করিয়া লইতে পারেন। এইরূপে ক্রমে যদি শিবানী হামিরকে একেবারে ভেড়া বনাইতে পারেন, তাহা হইলে তো আর লাভের সীমা নাই। তখন বিরোধের একটা সহজ মীমাংসা হইয়া যাওয়াও সম্ভব। কিন্তু কন্যার মানসিক বৃত্তি যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর উপকরণে গঠিত, তাহা মালদেব কিছুই ভাবেন নাই।

শিবানীর সেই সরল আত্মদানের নিকট সামাজিক সকল বাধা বিঘ্ন পরাস্ত মানিল। দেশাচারে বাধিলেও, বৎসরমাত্র-বয়স্কার বৈধব্যকে বৈধব্য বলিয়াই মনে লাগে না। হামির আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার গৃহলক্ষ্মী লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। শিবানীর মধুর আচরণে কেবল হামির

নহেন, চপলা, সন্ন্যাসী ও হাম্মিরের আত্মীয়বর্গও একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। মালদেবের আত্মজা হইলেও, পিতৃপ্রকৃতি কন্যাতে কিছুমাত্র সংক্রামিত হয় নাই। পূর্ব্ব হইতেই পিতার পাঠানানুগত্য ও স্বজাতিবৈমুখ্যের সহিত শিবানীর কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। এক্ষণে তিনি রাণাবংশের বধূ হইয়া কি উপায়ে সেই বংশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধৃত হয়, ইহারই চিন্তায় ও চেষ্টায় নিয়ত মগ্ন রহিলেন।

যথাসময়ে হাম্মিরের প্রেমতরুর এক বাঞ্ছনীয় ফল ফলিল। মহারাণা বর্ষ পরেই এক পুত্র লাভ করিলেন। এক দৈবজ্ঞ জানাইলেন, যে শিশুর মঙ্গলার্থ চিতোরের পুত্রক-দেবতার নিকট হাম্মিরের পূজা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। শিবানী এই মর্ম্মে পিতৃসমীপে পত্র প্রেরণ করিলেন। মালদেব দুহিতা ও জামাতাকে যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক চিতোরে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহারা চিতোরে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র মালদেবকে রাজধানী ত্যাগ করিতে হইল।

এই সময়ে রাজ্যের কয়েক স্থলে মীরজাতীয়েরা বড়ই উৎপাত করিতেছিল। তাহাদের দমনকল্পে মালদেব নিজেই অচিরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বনবীর ও হরিসিংহের হস্তেই চিতোরের ভার ন্যস্ত রহিল। হরিসিংহ প্রথমে হাম্মিরের প্রতি তেমন আদর ও যত্ন প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু মালদেবের চলিয়া যাইবার কিছু পর হইতে তাঁহার আচরণে একটু বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। নূতন কুটুম্বের সহিত সহসা তিনি ভারি আলাপ আপ্যায়ন জুড়িয়া দিলেন। হাম্মির স্ত্রী ও পুত্র সমভিব্যাহারে শীঘ্র বিদায় লইতে চাহিলে, হরিসিংহ তাঁহাদের

আরো কিছুদিন অবস্থিতির জন্য দার্ঢ্য-সহকারে অনুরোধ পর্য্যন্ত করিলেন। এবং তাঁহাদের সেবা ও যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে একান্ত মনোযোগ রাখিলেন। হামির এরূপ ভাবান্তরের বিশেষ কারণ কিছু পাইলেন না। তবে এরূপ ঠাণ্ডা ব্যবহারে সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত একটা মিটমাটের চেষ্টা হইতেছে, ইহাই মনে করিলেন। রাজধানীতে থাকিলে তাঁহারই লাভ, অনেক নূতন সন্ধানসংগ্রহ ও তত্ত্বাবিষ্কার হইতে পারে, এই ভাবিয়া হামির আরো কিছুদিন চিতোরে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইত্যবসরে একদিন দেখা গেল, হরিসিংহ ও বনবীর খুব একটা জমাট পরামর্শে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কার্য্যের উপলক্ষ না থাকিলে, অন্য সময় দুই ভ্রাতার বড় একটা সাক্ষাৎ হইত না। কি চেহারায়, কি চরিত্রে, উভয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হরিসিংহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠকায়। নিয়ত কঠোর চিন্তা ও নিষ্ঠুর কার্য্যে ডুবিয়া থাকায়, তাহার একটা কড়া ছাপ যেন চেহারার উপর স্থায়িরূপে লাগিয়া গিয়াছে। বাক্যে, দৃষ্টিতে, এমন কি অঙ্গসঞ্চালনেও এই কার্কশ্য স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। প্রয়োজনবশতঃ ইহাকে ঢাকিতে হইলে, হরিসিংহের যেন অনেকটা উদ্যম ও চেষ্টার দরকার হয়।

পক্ষান্তরে বনবীর নিতান্ত নিরীহস্বভাব, হরিসিংহের মতে একান্ত নারীভাবাপন্ন। বস্তুতঃ তাঁহার গঠনও তদনুযায়ী। হরিসিংহ অপেক্ষা বৎসরাধিকের জ্যেষ্ঠ হইলেও, বনবীরকে অনেক ছোট দেখাইত। আজও তাঁহার বদনমণ্ডল শ্মশ্রুরাজিতে কণ্টকিত হয় নাই, সম্ভবতঃ হইবার তত আশাও নাই। সহসা দেখিলে যেন বালক বলিয়া মনে হয়। এই আকৃতির মত বনবীরের প্রকৃতিও বড় কোমল। শুধু কোমল কেন, কিছু দুর্ব্বলও বলা যাইতে পারে। হরিসিংহের নিষ্ঠুর কার্য্য-কলাপের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র যোগ ছিল না। কিন্তু তাহাতে বাধা দিবার শক্তিও বড় ছিল না। হরিসিংহ অবশ্য মনে মনে বনবীরকে খুবই ঘৃণা করিতেন। কিন্তু এই কোমল-স্বভাব যুবার প্রতি মালদেবের স্নেহাধিক্য থাকায়, তাহা বড় কথায় বা কাজে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। আজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরিসিংহ বনবীরকে ডাকিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। কারণ মালদেব তাঁহার অনুপস্থিতিকালে হরিসিংহকে বনবীরের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

যে বিষয়ের জন্য উভয়ে একত্র হইয়াছেন, তাহাতে যেন দুই জনের মধ্যে কিছু মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। বনবীর স্বাভাবিক কোমলস্বরে বলিতেছেন,—

"এ কথায় আমি সায় দিতে পারি না।"

হরিসিংহ বিরক্তির ভাবে কহিলেন, "সূর্য্যের আলোর মত সুযোগ নিত্যই আসে না। যদি ইহার অবমাননা কর, চিরদিন অবমানিত থাকিতে হইবে।"

বনবীর। আর কি কোন পথ নাই যে, নিজের অভীষ্ট-লাভের জন্য নরকের দিকে এতটা ঘেঁসিয়া যাইতে হইবে?

হরিসিংহ। থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অন্ধকারে ঢাকা। ঘুরিতে ফিরিতে হয় তো গন্তব্যে পৌছান যায়, নয় গর্ত্তে পড়িয়া পা ভাঙ্গিবারও খুব সম্ভাবনা। কিন্তু যাহা মিলিয়াছে, চক্ষু বুজিয়া তাহাতে যাইলেও কোন বিপদ নাই।

বনবীর। তুমি এ পথ যতটা সুগম ভাবিতেছ, তাহা নহে। পিতা তাহা হইলে কি কোন আভাস দিয়া যাইতেন না?

হরিসিংহ। সম্ভবতঃ তখন ততটা তাঁহার খেয়ালে আসে নাই। আসিলে, নিশ্চয়ই তিনি এই পথ ধরিতেন। তাঁহার তো দেখিতে কিছু বাকি নাই। বিবাহ দিয়া মনে করিয়াছিলেন, সোনার চাঁদ জামাইকে হাতে পাইবেন। আত্মীয়তার প্রেমানলে একেবারে গলাইয়া দিবেন—।

বনবীর বাধা দিয়া বলিলেন, "এটা নিতান্ত ভুল বলিতেছ। এ তো আত্মীয়তা নয়, এ যে গালে চড় কসাইয়া মাথায় হাত। আপনারই হউক, আর পরেরই হউক আসল উদ্দেশ্যটা তো দেখিতে হইবে। এরূপ প্রেমানলের স্পর্শে যদি কাহারও ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠে তো বলিবার বড় কিছু নাই।"

হরিসিংহ। গোড়ায় যাহাই হউক, এখন তো সব দিক বেশ মানাইয়া গিয়াছে। পিতার যে একটু শোধ তুলিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইতেও বিধি তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। এরূপ বিবাহে হাম্মির তো কিছুই সেরূপ সমাজে অধঃপতিত হইলেন না।

বনবীর। দেখ, ওরা রাজপুতের সেরা বংশ। চাঁদে

কলঙ্কের মত এ সব একটু আধটু দোষ আড়ালেই চাপা পড়িয়া থাকে। সে সব লইয়া কেহ নাড়া চাড়া করিতে চায় না।

হরিসিংহ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "অন্য লোকের মত তুমিও চন্দ্রোপাসক হইতে চাও নাকি?"

বনবীরও হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সুধা পাইলে হইতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমাদের মত সর্পকুলের অদৃষ্টে তাহা নাই। অমৃতপ্রাপ্তি তো হইবেই না, লাভের মধ্যে জিবটাই দু'খানা হইয়া যাইবে।"

হরিসিংহ। যদি সর্পই হইয়াছ, তবে ভাল করিয়াই বিষ ঢালিয়া দাও। কেন মিছা আর দ্বিধা করিতেছ।

বনবীর পূর্ব্ববৎ সহাস্যে কহিলেন, "আমার ফণাটা ভাই, এত আকাশ অবধি উঠিতে পারে না—"

হরিসিংহ এবার বনবীরের বক্তব্য শেষ না হইতেই অস্থির-ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার না পারে, যাহার পারে তাহাকে কেন বাধা দাও?"

বনবীর ধীরস্বরেই কহিলেন, "হরিসিংহ, ভাবিয়া দেখ। আকাশে কেবল চাঁদই নাই, তাহার চারিদিকে গ্রহ জ্বলিতেছে। চন্দ্রের অনিষ্ট ঘটিলে, তাহারাও জোট বাঁধিতে ছাড়িবে না।"

হরিসিংহ। আঃ, সেগুলোকে তো ধর, আর গিলিয়া ফেলো। চন্দ্রকে খসাইতে পারিলে, কৈলবারা একেবারে দুই দিনেই নিরেট আঁধারে ভরাইয়া দেওয়া যাইবে। তবে শুভস্য শীঘ্রং, —কেমন?

বনবীর ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "পিতার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত ছিল। এখন যাহা ভাল হয়, তুমি

কর। কিন্তু ভাই, দেখো যেন কোন রকম রক্তপাতের ব্যাপার না হয়।”

হরিসিংহ। ভয় নাই। এখন এতদূর যাইতে হইবে না।

বনবীর আবার একটু বাধা দিবার রকমে বলিলেন, “ব্যাপার কত দূর গড়াইতে পারে, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়াছ ?”

হরিসিংহ ভ্রাতার এই অস্থৈর্য্যে বিরক্তিসহকারে বলিলেন, “প্রয়োজনই মনে করি না। প্রতি পদক্ষেপের পূর্ব্বে যদি এক প্রহর ধরিয়া ভাবিতে হয়, তবে কূর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। নিভৃতে কোমল শয্যায় দেহ ছড়াইয়া অনেক কল্পনার সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের উত্তেজনায় তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন খুঁজিয়া পাই না। আমি চাই কাজ। এতটা চিন্তাশীলতার উপযোগী স্থবিরত্ব আজও লাভ করিতে পারি নাই।”

এই সময় সেজের আলোকে একটা পতঙ্গ উড়িতে উড়িতে পড়িয়া জীবনলীলা অবসান করিল। বনবীর তৎপ্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেতপূর্ব্বক সহাস্যে বলিলেন,—“উনি খুব কর্ম্মশীল, চিন্তার কিছুমাত্র ধার ধারেন না।”

হরিসিংহ উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন, “উহা তো পুড়িল আর মরিল। কিন্তু আমাদের যে অনবরত পুড়িতে হইতেছে, অথচ মরিবার কতদিন আছে জানি না। কৈলবারার জীবন বহ্নি যতদিন জ্বলিবে, ততদিন আমাদিগকে আধপোড়া হইয়াই থাকিতে হইবে। সেই বহ্নি নিভাইবার উপায় হাতে পাইয়াছি, এখন কি কেবল ভীতনেত্রে ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকেই তাকাইয়া থাকিব, আর কল্পিত প্রেতমূর্ত্তিতে তাহা পূর্ণ করিব ?”

বনবীর এবার আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জানিতেন, বন্য বরাহকে বরং বশে আনা যায়, কিন্তু হরিসিংহকে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় হইতে বিচ্যুত করা নিতান্ত অসম্ভব। তাই তাঁহার সহিত আর বিতণ্ডায় লাভ নাই দেখিয়া বনবীর সে স্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন,—"জানি, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা তুলিলে, তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু তবুও ইহা সত্য যে অধর্ম্মে যাহার আরম্ভ তাহার পরিণাম কখন শুভ হয় না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই মন্ত্রণার পর হরিসিংহ হামিরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। হামির প্রাসাদপার্শ্বস্থ কোন নিভৃত কৃত্রিম কুঞ্জে বসিয়া ঘটনাপুঞ্জ পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকে নিসর্গের শত-কণ্ঠ-নিসৃত আহ্বান তাঁহার শ্রুতিমূলে আসিয়া আঘাত করিতেছিল মাত্র, দ্বার খুলিয়া মনোমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। সে মন্দির তখন অন্য যাত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে একটি তিল-ধারণেরও স্থান ছিল না।। হরিসিংহ সেই নিবিষ্টচিত্ত ভাবুকের পশ্চাৎ হইতে মৃদুহাস্যে কহিলেন,—

"মহাদেব এখন সমাধিগত নাকি?"

চমকিত হইয়া হামির তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে,

হরিসিংহ অভিবাদনপূর্ব্বক আবার কহিলেন, "না, কৈলাসে ফিরিতে বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন?"

হামিরও যথোচিত প্রত্যভিবাদন করিয়া স্মিতমুখে উত্তর দিলেন, "ফিরিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, এত সৎকারে ঘেরিলে, ইহার পর তাঁহাকে তাড়ানই ভার হইয়া পড়িবে।"

হরিসিংহ। চিতোরের তো আছে কেবল ধূলি আর ধূম, তাহাতে কি কৈলবারা-পতির মন উঠিবে?"

হামির। পাথরের ঢিবির চেয়ে সোনার ধূলার দাম অনেক।

হরিসিংহ অর্থযুক্ত ভঙ্গীতে কহিলেন, "কালের বশে যে সোনা নিতান্ত পিতল হইয়া গিয়াছে।"

হামির তাহা বুঝিয়া এবার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আবার তাহাতে পরশ পাথর ঠেকিলে, যে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।"

হরিসিংহ। এমন পাথর কোথায়?

হামির। রাজপুতের একতায় ও বীর্য্যে।

হরিসিংহ। ভবিষ্যতে কি আছে জানি না, বর্ত্তমানে তাহাদের তো কোন লক্ষণই নাই।

হামির। লক্ষণ আকাশে দেখা দিবে না। নিজেদের উদ্যমে তাহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

হরিসিংহ। বৃথা আশা, এখন দৈব প্রতিকূল।

হামির। নিজেদের শক্তি পরীক্ষা না করিয়া কেবল দৈবের ঘাড়ে কি দোষ চাপান ভাল?

হরিসিংহ। পরীক্ষার কম কি হইয়াছে। রাজ্য, রাজা, দেশ উৎসন্ন গিয়াছে। আরো কি হইবে?

হাম্মির দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "রাজপুতের দেহে কি আর রক্ত নাই, প্রাণে কি আর শক্তি নাই। যদি কিছুমাত্রও থাকে, পাঠানের হস্ত হইতে চিতোরের উদ্ধারার্থ তাহাও উৎসর্গ করা চাই।"

হরিসিংহ অতি বিজ্ঞ মন্ত্রীর ন্যায় কহিলেন, "এ বৃথা আত্মধ্বংস হইতে নিরস্ত হউন। পাঠানের গ্রহ এখন অনুকূল। লক্ষ্মণসিংহ আপনার অপেক্ষা হীনবল ছিলেন না। এত করিয়াও তিনি কি নিয়তির গতি রোধ করিতে পারিলেন। লাভের মধ্যে ধন, প্রাণ, মান সবই গেল—।"

হাম্মির উত্তেজিতস্বরে বাধা দিয়া বলিলেন, "তবে তাঁহার কাজ কিরূপ হইলে ভাল হইত?"

হরিসিংহ। পাঠানের সহিত একটা মিটমাট করাই উচিত ছিল।

হাম্মির কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "পদ্মিনীকে দিয়া নাকি?"

হরিসিংহ। অতীতে কি করিলে হইত, তাহার এখন আলোচনায় প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনি কেন এখন বিরোধের একটা মীমাংসা করিতেছেন না? এইরূপে দেশকে ক্ষেপাইয়া শত্রুর অব্যাহত অস্ত্রের মুখে ধরিতে পারিলেই কি বাহাদুরী হইল? দিল্লীশ্বরের সহিত একটা সন্ধি করিয়া ফেলাই কি এখন কর্ত্তব্য নহে?"

হাম্মির। যে রাজপুতের পবিত্র গৃহ অধিকার করিয়াছে, সে সেই গৃহ ছাড়িয়া যাউক। নহিলে তাহার সহিত বিবাদ মিটিবে কি প্রকারে?

হরিসিংহ। এত ক্লেশে অর্জ্জিত ধন কেহ কি সহসা ত্যাগ করিতে পারে?

হাম্বির। তবে সন্ধির কথা মুখে আনাই বিড়ম্বনা।

হরিসিংহ। বর্ত্তমানে চিতোরের আশা ছাড়িয়া দিন। সন্ধি অন্য সর্ত্তেও হইতে পারে না কি?

হাম্বির গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "জীবন থাকিতে নয়।"

হরিসিংহ। জীবন লইয়া এমন ভাঁটাখেলা করা আমার তো সঙ্গত মনে হয় না। যাহা থাকিলে লাভ আছে, দিলে বিশেষ ক্ষতি, আমার বুদ্ধিতে এমন জিনিষটা যতদিন পারা যায়, রাখাই ভাল। যদি জীবনটার পরিবর্ত্তে খানিকটা মাটি মুসলমানের হাতে ছাড়িয়া দিলে, সব দিক বজায় থাকে, তবে সেইটা করাই কি যুক্তিযুক্ত নয়? এখন চিতোর দিলে, সুবিধাক্রমে কখনো হয়তো তাহা অধিকারে আসিতে পারে; কিন্তু জীবনটা দিলে, তাহা যে চিরদিনের তরে হারাইতে হইবে।

হাম্বির সতেজে কহিলেন, "রক্তবীজের গল্পটা নিতান্ত অর্থহীন নহে। হাম্বিরের প্রতি শোণিতবিন্দু হইতে মিবারে শত হাম্বির দেখা দিতে পারে।"

হরিসিংহ এবার একটু ভাবিলেন। পরে মৃদুহাস্যে কহিলেন, "এ স্থান হইতে অন্যত্র আসুন, আপনার ভবিষ্যৎ-বক্তৃত্ব সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা যাইবে।"

উভয়ে তখন সেই কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন। নানা দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া হরিসিংহ হাম্বিরকে শেষে একটা কক্ষে লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে সেখানে বসাইয়া হরিসিংহ অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। কিঞ্চিৎ পরে সেই কক্ষের অপর পার্শ্বস্থ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তাহা স্থূল লৌহদণ্ডে সমাকীর্ণ, নির্গমনের

উপায় নাই। হরিসিংহ সেই দণ্ডশ্রেণীর অবকাশস্থানে মুখ রাখিয়া কহিলেন,—"তবে পাঠানের সহিত যুদ্ধই অনিবার্য্য ?"

হামির হরিসিংহের আচরণে সন্দিগ্ধ হইলেন। কিন্তু দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "নিশ্চয়।"

হরিসিংহ দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "এখনও ভাবিয়া দেখুন। যতদিন না দিল্লীশ্বরের সর্ত্তানুসারে সন্ধি স্থাপন করেন, ততদিন আপনি তাঁহার বন্দী।"

হামির ভীমনির্ঘোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "শোন দুরাচার, শত জন্ম থাকিলেও নয়। আমার মুক্তি অপেক্ষা আমার চিতোর বড়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেনাপতি জলধর বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। হামিরের কারা-রোধ-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র জলধর অবিলম্বেই সৈন্য ও সামন্তগণের সহিত চিতোরে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু পুরী-মধ্যে প্রবেশলাভ বড়ই সুকঠিন। হরিসিংহ প্রথমে অবশ্য ভাবিয়াছিলেন, নায়কবিহীন সামন্তগণ রাজধানী আক্রমণে কখনই সাহসী হইবে না। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নিশ্চিন্তও থাকেন নাই, শত্রুপক্ষের সম্ভাবিত আপতনের যোগ্যরূপেই নগর বিশেষভাবে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একণে সেই নেতৃহীন সামন্তবর্গের এই ক্ষিপ্রকারিতা ও উদ্যম দেখিয়া হরিসিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র

শঙ্কিত হইলেন না। তবে প্রথমে ইহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য নিজে সদলে বাহির না হইয়া কিছুদিন ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়াই যেন ইহাদের অধ্যবসায় ও সামর্থ্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যাহাই হউক, জলধর এত নিকটে আসিয়াও প্রভুর উদ্ধারার্থ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। প্রতিদ্বারে, প্রতি-প্রাচীরে অসংখ্য অনিদ্র চক্ষু নিয়ত আক্রমণকারীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। জলধর যে জালই পাতিতে যান, তাহা পাতিবামাত্রই বিপরীত কৌশলের ঝটিকায় একেবারে যেন লূতাতন্তুর ন্যায় ছিঁড়িয়া যায়। তিনি যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহার প্রতীকার যেন অরাতিপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত করিয়া বসিয়া আছে। তিনি যে পথই ধরেন, তাহারই সম্মুখে একটা মহা অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক আসিয়া খাড়া হয়। দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন যাইতেছে—অবিরাম উদ্যম ও চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু সাফল্য যেন সুদূরপরাহত। সৈনিকেরা উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান, সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণপ্রাচীর তাহাদের প্রতি যেন ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। সামন্তগণের নৈপুণ্য ও উৎসাহ সেই পাষাণতল পর্য্যন্ত আসিয়াই পর্য্যবসিত হইতেছে। বারম্বার অকৃতকার্য্যতায় সেনাপতি জলধর কিছু বিচলিত, সন্ন্যাসীঠাকুরও কিছু চিন্তান্বিত।

এমন সময় একদিন একটা ব্যাপার ঘটিল। সামান্য হইলেও, ইহা কিছু বিচিত্র। এক সৈনিকপুরুষ সেদিন ঘুরিতে ফিরিতে নগরপ্রাচীরের যেদিকে ঘন বৃক্ষশ্রেণী ছিল, সেই

দিকে আসিয়া পড়িল। স্থানটা একটু নিভৃত ও ছায়াময়—তাহার উপর আবার সন্ধ্যার কালিমা পড়ায়, ঐ ছায়া বৃক্ষের নিম্নভাগে বেশ একটু গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। সৈনিক একটা মোড় ফিরিয়া এক বৃক্ষতলে, যাহা অনেকে এরূপ সময়ে এরূপ স্থানে দেখিয়া থাকে, তাহাই দেখিল। দেখিল, ঘনপত্রের নীচে, আনত শাখা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মানা শুভ্রবসনা এক অনৈসর্গিক মূর্ত্তি। সৈনিক শিহরিয়া দুই এক পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। পত্রান্তরালবিসর্পী চন্দ্ররশ্মি প্রায়ই এরূপ আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকে, কিন্তু এখানে তাহা হয় নাই। সৈনিককে পিছাইতে দেখিয়া মূর্ত্তি মিহিস্বরে বলিল,—"পলাইও না। তোমার প্রতি আমি সুপ্রসন্ন।"

সৈনিক থামিল। কি জানি কিছু যদি দৈবকৃপায় লাভ হয়, এই ভাবিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া কহিল, "কি প্রকারে জানিব?"

উত্তর আসিল, "নহিলে এতক্ষণ তোমার গ্রীবাদেশ তোমার দেহের উপর অমন সোজা বসিয়া থাকিত না।"

ভীত সৈনিক একবার স্কন্ধোপরি হাত রাখিল—বোধ হয় দেখিয়া লইল বাস্তবিক সেই অঙ্গটা ঠিক স্থানেই আছে কি না। পরে পলায়নের উপক্রম করিয়া কহিল, "হাতখানা এত দূর পৌঁছিলে, কি করিতে বলা যায় না।"

মূর্ত্তি উত্তর দিল, "দূরে আছ বলিয়া নিরাপদ নহ। পলায়নপর হইলেও নিস্তার নাই। ইচ্ছা করিলে এই হাতটা এইখান থেকেই তোমার গলদেশ বেড়িতে পারে। তাহার নমুনা এই দেখ।"

সত্য সত্যই শুভ্র দণ্ডের মত কি একটা তিন চার হাত ঊর্দ্ধে উঠিল। সৈনিক এবার নিশ্চলভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন বৃক্ষতল হইতে আবার শব্দ আসিল, "যাক, হাত আর বেশী বাড়াইয়া তোমাকে ভয়ার্ত্ত করিব না। এক্ষণে যাহা আদেশ করিতেছি, পালন কর। শুভ হইবে।"

সৈনিক যুক্তকরে কহিল, "দাসের ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। দাস একান্ত আপনার অধীন।"

মূর্ত্তি কহিল, "তবে যাও, শীঘ্র সেনাপতিকে এখানে ডাকিয়া আনো। বলিও, এই পুরীর এই অবরোধ সম্বন্ধেই তাঁহার সহিত বিশেষ কথা আছে।"

সৈনিক "তথাস্তু" বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। মূর্ত্তি যে একখানা শুষ্ক কাষ্ঠদণ্ডের উপর নিজের ওড়নাটা উচু করিয়া ধরিয়াছিল, তাহা নামাইয়া দেহের যথাস্থানে রাখিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সৈনিকের সহিত সেনাপতি আসিয়া দেখা দিলেন।

তরুতলস্থ মূর্ত্তি কহিল, "আপনি কি দেবতার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসবান ?"

সেনাপতি হাসিয়া বলিলেন, "দেবতা অপেক্ষা মানুষেরই আমার এখন বেশী দরকার! যে হও, আলোতে এসো।"

ক্ষীণ চন্দ্রালোক ইত্যবসরে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মূর্ত্তি বলিল, "যদি না যাই ?"

সেনাপতি। বাঁধিয়া আনিব।

মূর্ত্তি। যদি আকাশে মিশিয়া যাই ?

সেনাপতি এবার একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন, "দাঁড়াও তাহার আগেই তোমার দেহটা মাটিতে পিষিয়া ফেলিতেছি।"

এই বলিয়া সেনাপতি দুই এক পদ অগ্রসর হইবামাত্র মূর্ত্তি এবার বৃক্ষতল ছাড়িয়া আসিল এবং অভিবাদনপূর্ব্বক একটু দূরে দাঁড়াইল। সেনাপতি দেখিলেন—এক পূর্ণযৌবনা সুগঠনা শ্যামাঙ্গী রমণী। তাহার আপাদমস্তক লম্বিত ওড়নায় আবৃত। মুখের অবয়ব ততটা বোঝা যাইতেছিল না, কারণ সে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে কতক ছায়া কতক আলো। তবে সে যে তাহার নবোদ্গত-চ্যুত-পত্রসম অঙ্গুলির আবেষ্টনে একখানা সুন্দর ডালা ধরিয়াছিল, তাহা বেশ দৃষ্টিগোচর হইল।

সেনাপতি এবার একটু বিরক্তিসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি?"

রমণী হস্তস্থিত ডালা দেখাইয়া বলিল, "আমার পরিচয় এই ডালার ভিতর।"

সেনাপতি। উহাতে তো কতকগুলা ফুল। তুমি কি ফুলের ব্যবসা করিয়া থাক?

রমণী। সেনাপতির মত আপনার অনুভব-শক্তি আছে বটে। আমি একজন ফুলওয়ালী।

সেনাপতি। তোমার এরূপ আচরণের হেতু কি?

রমণী। আপনারা কেল্লা জয় করিতে আসিয়াছেন। কে কেমন বীর তাই দেখিতেছিলাম।

সেনাপতি একটু বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এ শুধু

তবে তোমার বালিকাসুলভ চপলতা। আচ্ছা, এখন পরীক্ষা শেষ হইয়াছে তো? আমি চলিলাম।"

রমণী হাসিয়া বলিলেন, "পরীক্ষায় আপনার বীরত্ব প্রমাণিত হইলেও, ধীরত্বের কিছু অভাব আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

সেনাপতি গম্ভীরমুখে বলিলেন, "মুখরা বালিকার সহিত বাদানুবাদ করিবার আমাদের এ সময় নয়।"

এই বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন।

রমণী তাঁহাকে ফিরাইয়া কহিল, "মহাশয়, বালিকা শুধু মুখরা নয় কার্য্যপরাও বটে। একটা বিশেষ কথা আছে। একা থাকিলেই ভাল হয়।"

সৈনিক একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি ফিরিয়া কহিলেন, "কি বল।"

রমণী। আপনি আমাকে এত অগ্রাহ্য করিতেছেন কেন?

সেনাপতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি চাও?"

রমণী। কৃষ্ণ যখন কংসকে মারিতে যান, তখন তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল কে জানেন?

সেনাপতি বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, "পুরাণ আলোচনার এ স্থান বা কাল নহে।"

রমণী যেন উত্তেজনা সহকারে বলিল, "বোধ হয় জানও ততটা নাই। নহিলে সামান্যা নারী বলিয়া উপেক্ষিত হইতাম না। লোকে যাঁহাকে ভগবানের অবতার বলে, তিনিও কুব্জার প্রদত্ত প্রসাধন সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

সেনাপতি এবার হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও বুঝি তোমার

ফুলগুলি এই সুযোগে কাটাইতে চাও। কিন্তু কুব্জা অনেক মূল্য আদায় করিয়াছিল। তোমারও অভিপ্রায় যদি সেইরূপ হয়, মনে রাখিও, আমাদের সেরূপ মূল্য দিবার শক্তিও নাই, ইচ্ছাও নাই।"

রমণী এবার কিছু যেন রোষভরে বলিল, "সেনাপতি মহাশয় দেখিতেছি, শুধু বীর নহেন রসিকও বটেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিছুমাত্র সুসঙ্গত হয় নাই। আমি কুব্জার মত প্রসাধনও দিতে আসি নাই এবং তাহার মত দামও লইতে চাহি না। আমরা মহারাণা হামিরের প্রজা। তাঁহার বিপদে কিছু সাহায্য করিতে চাই। সামান্য ফুলওয়ালী বলিয়া আপনি কিন্তু একেবারে কথাটা উড়াইয়া দিতেছেন।"

সেনাপতি ভারি বিব্রত হইলেন। এই অজ্ঞাতকুলশীলা নারীকে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমার ভ্রম মার্জ্জনা কর। তুমি কি প্রকারে সাহায্য করিবে?"

রমণী। এই ফুলের দ্বারাই করিব।

সেনাপতি। বুঝিলাম না।

রমণী। বোঝা উচিত ছিল। কুব্জা কোথায় প্রসাধন যোগাইত?

সেনাপতি। রাজবাড়ীতে।

রমণী। আমিও তাহাই করিয়া থাকি।

সেনাপতি সন্দিগ্ধ হইয়া কহিলেন, "কিন্তু এখন যে সব যাতায়াত বন্ধ।"

রমণী। বন্ধ কি না আমি বুঝিব। আপনার যদি কিছু সংবাদ থাকে, আমি ভিতরে দিতে পারি।

সেনাপতি এবার প্রফুল্লবদনে কহিলেন, "যদি পার, পুরস্কার তদনুযায়ী পাইবে।"

রমণী। আপনার সামান্য পুরস্কারের আশায় নহে, আমার অন্য স্বার্থ আছে। আমি শুধু সংবাদ বহন করিয়াই ক্ষান্ত হইব না। আপনি কল্যই এইখানে এইরূপ সময়ে একা আসিয়া অপেক্ষা করিবেন। স্থলপথেই হউক আর আকাশ-পথেই হউক, আপনার নিকট পুরীর বিবরণ পাঠাইব। আপনাদের বাহিরের অবস্থা আমার বিশেষ জানা আছে। তাহার আর আলোচনায় এখন প্রয়োজন নাই। এখনই না যাইলে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। ঠিক আসিবেন, নহিলে সব পণ্ড হইবে।

সেনাপতি জলধর স্থিরচিত্তে শুনিতেছিলেন। রমণীর শেষ কথায় একটু যেন চমকিয়া উঠিলেন। শেষের স্বরভঙ্গীটা যেন অন্য রকম ঠেকিল কেন? রমণী দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছিল। সেনাপতিকে কিছু অন্যমনস্ক দেখিয়া এবং কোন উত্তর না পাইয়া দূর হইতেই আবার দৃঢ়স্বরে কহিল,—"দেখিবেন, আপনার উপস্থিতির উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

সেনাপতি বলিলেন, "শীঘ্র যাও, সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নগরের অন্যান্য প্রবেশপথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সদরের বড় দরজা এখনও খোলা, তাহাও অচিরে রুদ্ধ হইবে। যে দুই একজন চর শত্রুবর্গের পরিদর্শনে গিয়াছে, প্রহরীগণ তাহাদেরই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, আসিলেই দ্বার বন্ধ করিবে।

প্রাচীরের মাথায় মশাল জ্বলিতেছে। রাত্রির প্রহরীগণ যথোপকরণে সুসজ্জিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থিত আছে। দূরে শত্রুশিবিরও আলোকমালায় সাজিয়াছে। কিন্তু এত লোকের চলা, বলা ও ফেরার মধ্যে কোন প্রকার চীৎকার বা চাঞ্চল্য নাই। পুরীর মধ্য হইতেও তেমন কোন উচ্চ শব্দ আসিতেছে না। অবরুদ্ধ নগরের নরনারীর কণ্ঠে বাক্যও যেন কিছু অবরুদ্ধ। নিশাচর প্রাণিগণ নিজ নিজ আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া নিকটে তেমন লোকের যাতায়াত না থাকিলেও স্বচ্ছন্দে বেড়াইতেছে না। তাহারাও চারিদিকে যেন একটা ভীতিজনক পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছে।

পুষ্প-ব্যবসায়িনী ক্রমে সেই খোলা দ্বারের কাছে আসিল। অপরাপর সৈনিকগণ ছাড়া দ্বারের সম্মুখভাগে দুইজন প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের বেশ সামরিক বিভাগের নিম্ন কর্ম্মচারীর মত। দূর হইতেই ফুলওয়ালীকে লক্ষ্য করিয়া একজন অপরকে কহিল,—"লোকটা আজ মেয়েমানুষ সেজেছে নাকি?"

অপর প্রহরী বলিল, "তাই তো অমন গোঁপ দাড়িগুলোর

এই দশা! এত তেল জল খাইয়ে পালন করে শেষে এমনটা করলে!"

প্রথম প্রহরী কহিল, "টাকার লোভে আস্ত মাথাটাই লোকে দিতে বসেছে, সেই মাথার একটা সামান্য ভগ্নাংশের আবার কথা।"

দ্বিতীয় প্রহরী এবার দুই হাতে নিজের শ্মশ্রুরাজি একবার তোয়াজ করিতে করিতে কহিল, "না দাদা, এদের যদি কেহ অগ্রাহ্য করে তো ভারি দুঃখ হয়।"

প্রথম। ওহে, ও জিনিষগুলো নিজের গ্রাহ্য ও পরের অগ্রাহ্য থাকাই ভাল।

দ্বিতীয়। কেন বল দেখি?

প্রথম। অবশ্য তোয়াজ করিতেই নিজে গ্রহণ করেছ। কিন্তু পরে যখন ধরিবে, তখন টানা হেঁচড়া, নাড়া ও ছেঁড়া ভিন্ন আর কিছু করিতে চাইবে না।

দ্বিতীয়। তুমি দেখ্‌ছি সাদা কথা থেকে একেবারে মুগ্ধবোধে চলে গিয়েছ। তোমার ভাই, ও শাস্ত্রটা একটুও হজম হয় নাই। তাই যখন তখন তার ভারি উদ্গার উঠে।

প্রথম। যে যে বিষয়ে বিদ্যাটার সঙ্গে কানমলার মাত্রা বেশী খাওয়া গিয়াছে, সেগুলোকে আজও বুঝি জীর্ণ করিতে পারা যায় নাই। জান তো ভেজাল দ্রব্যটা ভারি দুষ্পাচ্য—

রমণী এই সময় দ্বারের খুব নিকটে আসিল। দ্বিতীয় প্রহরী তাহাকে বিশেষভাবে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—

"আরে এ কি? এ যে একেবারে একটা আসল ফুটন্ত অপরাজিতা।"

প্রথম। আমার স্কন্দন্তের মত তোমার অলঙ্কারের যায়গাটায় বুঝি বেশী কর্ণপীড়ন হয়েছিল। যাহক ফস্ করে একটা খুব কাব্য গড়ে ফেলেছ। এসো আমরা হু'জনে হু'টো টোল খুলে বসি। হুয়ারে দাঁড়িয়ে আর হিম খাওয়া যায় না।

ফুলওয়ালী এবারে তাহাদের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "শুধু হিম নয় দ্বারবানজী আর কিছু শক্ত জিনিষেরও বন্দোবস্ত হতেছে।"

অপরিচিত রমণীকে সহসা এইরূপ আলাপ করিতে দেখিয়া প্রহরীর রসিকতা-বৃত্তি খুব প্রবল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু এই আমন্ত্রণকারিণীর আকার, ইঙ্গিত ও কথার এমন একটা অর্থ ছিল, যাহা তাহার সে ইচ্ছাটাকে একেবারে দমাইয়া দিল। প্রথম প্রহরী কহিল,—

"তার মানে কি? তুমিই বা কে গা?"

রমণী। আমি কে পরে বলিলে চলিবে, এখন মানেটাই আগে বলি। দূরে ঐ ঝোপের পাশে কিছু দেখিতে পাইতেছ?"

প্রথম। একটা ছোট আলো।

দ্বিতীয়। একটা নয় হে, হুটো।

প্রথম। তিনটাও হতে পারে—

দ্বিতীয় প্রহরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ঝোপের ভিতর অনেকগুলো যেন জোনাকির মত মিটমিট করছে।

রমণী। যে ক'টাই হউক, উহা তোমাদের কি মনে হয়?"

প্রথম। তাই তো ওখানে তো কোন লোকজনের বাস নাই।

দ্বিতীয়। বোধ হয় কোন যাত্রীর দল পাক শাক করছে।

রমণী। হাঁ, তোমাদের শীঘ্রই নিমন্ত্রণ করিতে আসিবে।

প্রথম প্রহরী হাসিয়া কহিল, "তাহলে তোমার শক্ত জিনিষের অর্থটা বেশ ত মধুর হয়েই পড়্‌বে। ভায়া, কি নূতন সদর্থ। ছিঁড়ে ফেল তোমার অমরকোষ।"

এই সময়ে সেই আলোকের দিকে কি যেন ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিল। রমণী কহিল,—

"ঐ দেখ তোমাদেরই অমরত্বটুকু ছিন্ন করিবার জন্য কোষ হইতে তরবারি বাহির হইতেছে।"

প্রহরীদ্বয় এবার সভয়ে দেখিল, সত্যই আলোকে যেন অস্ত্রের মত কি ঝকমক করিতেছে।

রমণীকে কহিল, "ব্যাপারখানা কি?"

রমণী বলিল, "এখনও বুঝিতে পারিতেছ না? পাহাড়ীরা এই দরজার উপর সহসা আক্রমণের যোগাড় করিতেছে। অবিলম্বে ভিতরে চল। আমার যাহা বক্তব্য কুমার হরিসিংহকে জানাইব।"

প্রহরীরা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল, কিন্তু রমণী ভিতরে প্রবেশ করিয়া কুমারের অন্বেষণে যাইল কি?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

না, একেবারেই নয়। নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফুলওয়ালী কুমারের নিকট গমনার্থ চেষ্টামাত্রও করিল না। আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় প্রহরীরা ভারি ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেদের কাজ গুছাইয়া লইতেই তাহারা কিছুক্ষণ এত ব্যস্ত

থাকিল যে, রমণীর কথা একেবারে ভুলিয়াই গেল। যখন কথাটা মনে আসিল, তখন রমণী কিন্তু আর নয়নপথে আসিল না। ইতস্ততঃ রমণীর অন্বেষণার্থ একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রহরীরা মনে মনে যাহা হয় একটা স্থির করিয়া ফেলিল। সম্ভবতঃ ভাবিল, রমণী তাহাদিগকে বোকা বনাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। সোজা কথায় পাছে তাহারা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে না দেয়, এই আশঙ্কায় রমণী কৌশলের জাল পাতিয়াছিল। প্রহরীরাও দিব্য নিরীহ প্রাণীর মত তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছে। সেইজন্য বোধ হয়, তাহারা এ বিষয়ে হরিসিংহকে কিছু জানান দূরে থাকুক, আর বেশী উচ্চবাচ্য না করিয়া শান্তভাবে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল।

ওদিকে ফুলওয়ালী অপেক্ষাকৃত একটা সংকীর্ণ পথ ধরিয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিতে লাগিল। পথ এখনও পূর্ব্ববৎ জনসমাকীর্ণ না হইলেও, নিতান্ত নির্জ্জন নহে। সন্ধ্যার আগমনে অনেকেই দিবসের কার্য্য সারিয়া গৃহাশ্রিত হইয়াছে, তথাপি অনেকে এখনও সেই নবালোকিত রাজপথ ত্যাগ করে নাই। কিন্তু কি পথ, কি গৃহ, কোন স্থানই যেন তেমন মুখর ও কোলাহলপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে না। সান্ধ্য আরতির শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত হইয়া কিয়ৎপূর্ব্বে নীরব হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোন রঙ্গরসেরও উচ্ছ্বাস-রোল শ্রুতিগোচর হইতেছে না। যাহারা গৃহে আছে, তাহারা নীরবেই গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। যাহারা পথে আছে, তাহারা নীরবেই পথ অতিক্রম করিতেছে। কেবল কোথাও কোন গৃহের কক্ষে কিংবা কোন রথ্যার বক্ষে দুই চারজন লোক দলবদ্ধ হইয়া অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

প্রধানতঃ এই কথাবার্ত্তার উপলক্ষও নগরের সেই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা। সম্মুখে মহা ঝটিকার ভৈরবী মূর্ত্তি, সমস্ত পুরীটা যেন উৎকর্ণ হইয়া কখন কি ঘটে, তাহাই শুনিবার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিতভাবে বসিয়া আছে।

ফুলওয়ালী সেই সজন অথচ নীরব পথ ধরিয়া নীরবেই চলিয়াছে। অন্য দিন হইলে নিশ্চয়ই অনেকে তাহাকে সম্ভাষণ করিত। কিন্তু আজ তাহার ফুলের ডালা কাহারই নয়ন ও মন আকৃষ্ট করিতে পারিল না। নিজের বিক্রেয় দ্রব্য কাটাইবার জন্য ফুলওয়ালীরও বিশেষ কোন আগ্রহ লক্ষিত হইল না। অন্যান্য পথিকদিগের ন্যায় সেও নীরবে অথচ নিঃসঙ্কোচে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে একবার দুইজন লোকের কথোপকথনে সে যেন একটু আকৃষ্ট হইল। ইহারা দুইজনই প্রহরী। দিবসের কার্য্যের শেষে গৃহে ফিরিতেছিল। একজন অপরকে কহিতেছে,—

"বড় কুমারকে তো আগে কখন বন্দীশালায় দেখা যায় নাই।"

অপর বলিল, "শুনিয়াছি তিনি লজ্জায় ভগিনীপতির কাছে মুখ দেখাইতেন না।"

প্রথম। লোকটার একটু ধর্ম্মজ্ঞান আছে বুঝি? কিন্তু আজ সে লজ্জাটা চট্‌ করে ভেঙ্গে গেল কিসে?

দ্বিতীয়। কিছু নয়, সব ভান। বোধ হয়, ভয়ে পড়ে আজ একটু মন রাখ্‌তে এসেছিল।

প্রথম। যাহাকে মুঠোর ভিতর পুরেছে, তাহাকে আবার ভয় কি?

দ্বিতীয়। কে জানে কোন দিন মুঠোটা ফস্‌কে লোকটা ছুট্‌কে যায়।

প্রথম। তাই হবে। আবার মুটের মাথায় করে কি আনা হয়েছিল ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "উপহার—উপহার। প্রীতিবৃক্ষের গোড়া কেটে আগায় জল।"

প্রথম ব্যক্তি মাথা নাড়িয়া কহিল, "ফলও সেইরূপ ফলিবে। তুমি তো খুব কাছেই ছিলে। আচ্ছা জিনিষটা কি হে ?"

দ্বিতীয়। মকমলের শয্যা আর উপাধান। লোকটার যেমন মেয়েলী গঠন, উহার উপহারও তদ্রূপ। বন্দীকে ওরূপ জিনিষ দেওয়া উপহার তো নয়, উপহাস।

প্রথম। একি ওর পোষা হীরামন যে, সোনার শিকল পায়ে দিয়ে রূপার বাটিতে খেতে দিবেন, আর সে অমনি ওর মনের মত মধুর বুলি আওড়াবে !

দ্বিতীয়। বীরপুরুষ কি ওসব গ্রাহ্য করে।

প্রথম। সত্যি ভাই, হাম্বিরের মত পালোয়ান কখন চক্ষে দেখি নাই। ও বাহিরে এসে অস্ত্র ধর্‌লে কি আর রক্ষে আছে ?"

এই সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির গা টিপিয়া কহিল, "লোকটা তার এরূপভাবে উপহার দেওয়ার কথা অবশ্য গোপনে রাখতে চায়। কোন দিন ওটাই তো রাজতক্তে বস্‌বে। কে যেন পিছনে আস্‌ছে।"

ইহার পর তাহারা অন্যদিকে চলিয়া গেল। ইহারা অবশ্য

অনুচ্চস্বরেই কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। কিন্তু ফুলওয়ালী এতটা তাহাদের কাছ ঘেঁসিয়া যাইতেছিল যে, তাহার অধিকাংশই সে শুনিতে পাইল। ইত্যবসরে ফুলওয়ালী প্রাসাদের অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দূর হইতে আলোকমালায় সজ্জিত প্রাসাদশ্রেণী যেন নক্ষত্রসমাকুল একখণ্ড শুভ্র মেঘের মত বোধ হইতেছিল। রাজবাড়ীর আনন্দের অন্য নিদর্শনের আজ অভাব থাকিলেও, আলোক সম্বন্ধে তাহার সজ্জার কিছুমাত্র অঙ্গহানি লক্ষিত হইল না। আসন্ন বিপদ গীতবাদ্য ও অন্যান্য আমোদের কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু দীপের সংখ্যা কমে নাই বরং আরো বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। কেন না এরূপ সঙ্কটকালে অন্ধকারের মূর্ত্তিটাই বড় ভীতিপ্রদ ও সন্দেহজনক। পাছে রজনীতে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় হরিসিংহ সমগ্র পুরীটা অধিকতর আলোকিত করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

ফুলওয়ালী ক্রমে তোরণ অতিক্রমপূর্ব্বক প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিল। এখনও রাত্রি বেশী হয় নাই। চারিদিকে লোকজন দাস দাসী যাতায়াত করিতেছিল। কেহ বড় তাহাকে লক্ষ্য করিল না। লক্ষ্য করিবারও এমন কিছু ছিল না। পরস্পরের অজানা অচেনা লোকও, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক সেখানে

নানা কাজে ফিরিতেছিল। পুষ্পবিক্রেত্রী, ফলবিক্রেত্রী ও শিল্প-ব্যবসায়িনী অনেক রমণী রাজান্তঃপুরের ভিতরেও এরূপ সময় বিচরণ করিত। ফুলওয়ালী যেন রাজবাড়ীর কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার উদ্দেশে তাহার ডালাটা লইয়া যাইতেছে, এইরূপ ভাবে সে কতকটা সাধারণের সহিত নিঃসম্পর্কিত অথচ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে জনসমূহের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। সে কোন স্থানে দাঁড়াইতেছিল না, কাহারও সহিত কথা কহিতেছিল না, কিংবা অন্য প্রকারেও মিশিতেছিল না অথচ অতি সহজগতিতে স্বীয় গন্তব্যাভিমুখে চলিতেছিল। কিন্তু এইরূপে যাইতে যাইতে সহসা তাহার উদাসীনতা বা অসামাজিকতা স্ফটিকবৎ অতি সহজে ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় কিছু না হঠাৎ সে পার্শ্বস্থা এক রমণীর গলদেশে একগাছা মোটা ফুলের মালা ঝুলাইয়া দিয়া বসিল। অভ্যর্থিতা স্ত্রীলোকটি কহিল,—

"ফুলওয়ালীর এই কাঁচা বয়সেই চোখের দোষ ঘটিয়াছে নাকি?"

ফুলওয়ালী মালাছড়াটা দিয়াই একটা স্তম্ভের পাশে খাড়া হইয়াছিল। বলিল, "কেন গা?"

স্ত্রীলোক। আমি তোমার মালার আল্‌নাও নহি কিংবা তোমার বরপদপ্রার্থীও নহি।

ফুলওয়ালী। আমার দুইটার একটারও অভাব নাই গো।

স্ত্রীলোক তাহার কথায় বাধা দিয়া সুর করিয়া বলিল, "তবে তোমার এমন স্বভাব কেন গো?"

ফুলওয়ালী সুরে সুর মিলাইয়া বলিল, "তোমার রূপের এমনি প্রভাব গো।"

স্ত্রীলোক। আমার রূপ আছে কি না জানি না। কিন্তু সে তো এ অবধি একজন ছাড়া কাহারও হাত থেকে মালা কাড়িয়া লয় নাই? ফুলওয়ালীর নিত্যই এদিকে আসা হয় নাকি?

ফুলওয়ালী। যদি তাহাই হয়, আমার বোঝাটা রোজ একটু লঘু করিয়া দিবে?

স্ত্রীলোক। এরূপ ভাবে যদি লঘু করিতে চাও তো কণ্ঠ অনেক মিলিবে। তবে আজ কিছু দক্ষিণা লইয়া যাও।

এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি মালার মূল্য দিতে গেল। সে মনে করিয়াছিল, কোন ক্রেতা না জোটায়, ফুলওয়ালী তাহর উপর দিয়াই এই অছিলায় এক ছড়া কাটাইতে চায়। কিন্তু পুষ্প-বিক্রেত্রী দাম গ্রহণ করিল না। স্ত্রীলোকের হস্তস্থিত ধাতু মুদ্রাটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"অমন নরম জিনিষ দিয়া এমন কড়া জিনিষ লইব না।"

স্ত্রীলোক একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "তবে কি চাও?"

ফুলওয়ালী। ঐ শ্রীমুখের দু'টো কোমল বাণী।

স্ত্রীলোক। তাহা কি যথেষ্ট হয় নাই?

ফুলওয়ালী। আমার ফরমাজি আর কিছু চাই।

স্ত্রীলোক। বল, দেখি আছে কি না।

ফুলওয়ালী। রাজার অন্দরের কিছু কথা।

স্ত্রীলোক এবার কিছু সন্দিগ্ধ হইল। বলিল, "সে পুঁজি আমার খুব কম। তাহা হইলে বড় কিছু আশা নাই।"

ফুলওয়ালী। মহারাণী শিবানীর খবর কিছু দিতে পার?

এই কয়টি শব্দের উচ্চারণে ফুলওয়ালীর স্বর যেন একটু

বদলাইয়া গেল। সে এতক্ষণ একটু ছায়াময় স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। স্ত্রীলোকটি এবার তাহাকে টানিয়া আলোকে আনিল। পরে অত্যন্ত বিস্মিতের ন্যায় কহিল,—"সে কি, এতদূর ?"

ফুলওয়ালী মৃদুহাস্যে উত্তর দিল, "কেবল পরের চোখের দোষ ধরিলে হয় না। নিজের চোখ সাফ রাখিতে হয়।"

স্ত্রীলোক হাসিয়া বলিল, "মানুষের দু'টো বই চক্ষু নাই, তাহাতে কিন্তু কুলায় না। ভাগ্যে কান দু'টো একটু তীক্ষ্ণ ছিল। চোখের ঘোর এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই।

ফুলওয়ালী। একটু নিভৃত যায়গায় চল, সব ঘোর কাটাইয়া দিব।

তৎপরে দুইজনে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে হামির-মহিষী শিবানী কক্ষান্তরে একাকিনী বসিয়াছিলেন। ঘরে মৃদু আলোক জ্বলিতেছিল। বারাণ্ডার দিকের একটা খোলা দ্বার দিয়া সেই আলোক রজতের পাতের মত বাহিরে পড়িয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফুলওয়ালী সেই বারাণ্ডায় গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হস্তস্থিত ডালাটা সেই আলোকের পাতের উপর রাখিয়া নিজে কবাটের পাশে উপবেশন করিল। শিবানী যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতে তাহার ডালাটা বেশ লক্ষ্য হইতেছিল। এইরূপ ভাবে বসিয়া ফুলওয়ালী কহিল, "দেখুন রাণীমা, আমাদের আর ব্যবসা চলে না।"

শিবানী বড় কিছু কাজে ছিলেন না। এই অপরিচিতার আলাপে একটু যোগ দিতে অনিচ্ছা হইল না। কহিলেন,—"কি হয়েছে গা?"

ফুলওয়ালী। পুরীর এই অবরোধ না ঘুচিলে, আমাদের জিনিষ তো আর বিকায় না।

শিবানী। কারণ কি?

ফুলওয়ালী। কে কিনিবে, সকলেই ভাবনায় অস্থির। লোকে সখ করিয়া ফুল কিনে। ভাবনা থাকিলে কি আর সক থাকে। এই রাজবাড়ীতেই কত ফুল কাটিত। এখন কেহ আমাদের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। কিন্তু পোড়া উদরের ক্ষুধা তো যেমন তেমনই আছে। তাই মা, আমাদের বড় দুঃসময়।

শিবানী। ফুল শুধু সখের জিনিষ নয়, পূজায়ও লাগে। দেশে কি পূজাও বন্ধ হইয়াছে?

ফুলওয়ালী। তবে ব্যবসাদারী ছাড়িয়া সত্য কথা বলি মা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্ষতি যতটা হইবার কথা ততটা হয় নাই। একদিকে আমাদের ক্ষতি হইলেও, অন্যদিকে তাহা কতক পোষাইয়া যাইতেছে। আজকাল লোকে ভারি পূজাপরায়ণ, সে দিক দিয়া বেশ আমরা দুই এক পয়সা পাইতেছি।

শিবানী। লোকে বুঝি বিপদে পড়িয়া ঠাকুরভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ফুলওয়ালী অপেক্ষাকৃত অনুচ্চস্বরে কহিল, "শুধু নিজের বিপদের জন্য নয়, পরের মঙ্গল-কামনাও আছে।"

শিবানী। কাহার ?

ফুলওয়ালী। দেশের যিনি মালিক তাঁহার।

শিবানী ঘৃণার স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তিনি, দিল্লীর মহম্মদ শাহ ?"

ফুলওয়ালী উত্তর দিল, "না রাণীমা, মিবার তো কোন দিনই তাঁহাকে মালিক বলিয়া স্বীকার করে নাই।"

শিবানী। তবে কে ? চিতোরের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা ?

ফুলওয়ালী। তিনিই বা মালিক কিসে, তিনি তো দিল্লীশ্বরের প্রসাদভোগী নফর মাত্র। মনরাখা মিথ্যা কহিতেছি না। লোকসাধারণ মহারাণা হাম্মিরেরই কল্যাণকামী। এখন বিদায় হই মা, অনেক স্থানে ঘুরিতে হইবে। রাণীমার ফুলদানীতে কিছু রাখিয়া যাইব কি ?

শিবানী তাহাকে অনুমতি দিলেন। ফুলওয়ালী কহিল, "অনেক স্থানে বেড়াইয়াছি। পা দু'টা ধুইয়া আসিয়া তবে রাখি।"

এই বলিয়া ফুলওয়ালী বারাণ্ডার বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহার ফুলের ডালাটা তাহার ধারে রাখিল। তৎপরে পার্শ্বস্থ স্নানাগারে প্রবেশ করিল। শিবানী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিলেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তাঁহার চক্ষু স্নানাগারের দিকে ফিরিল, তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ে ও সন্দেহে চমকিয়া উঠিলেন। কক্ষ ও স্নানাগারের মধ্যস্থ প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া এ কে ? কনক-গৌর-কান্তি রাজপরিচ্ছদধারী কে এ তরুণ যুবা ? শিবানীর প্রথমে তাহাকে তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রজ, বনবীর বলিয়া মনে হইল। কারণ ইহার পরিচ্ছদটি ঠিক বনবীরের

পোষাকেরই অনুরূপ। কিন্তু তিনিও তো নহেন! যুবা হাসিয়া কহিলেন,—"মহারাণি, সাজটা কেমন মানাইয়াছে ?"

এ যে বড় পরিচিত কণ্ঠ, কিন্তু ঠিক ধরিতে পারা যাইতেছে না। যুবা এবার উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদ উন্মোচন করিতে করিতে বলিল, "এ সাজের মত কাজটাও কি আমাকে মানাইবে না ?"

সহসা পরিচ্ছদের ভিতর হইতে এক চম্পকবর্ণা ইন্দুনিভাননা নবীনার আবির্ভাব হইল। ইন্দ্রজাল আর কি!

শিবানী এবার উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া উল্লাস-সহকারে বলিলেন, "যা হক, চপল', বিদ্যাটা সার্থক শিখিয়াছিলে। সেবারকার ভৈরবীর মত এবারের ফুলওয়ালীর বেশটা কেমন খাটিয়াছিল, দুঃখের মধ্যে তেমন ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। ভাল, শাস্তাকে পাইলে কোথায় ?"

চপলা। আসিবার পথে।

পরে পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "রাজা-রাণীরা কাহারও পরা বেশ ব্যবহার করেন না। এগুলো অবশ্য আমারই প্রাপ্য ?"

শিবানী হাসিয়া কহিলেন, "ইহারই মধ্যে বরের সাজটা নিজেই যোগাড় করিয়া রাখিবার ইচ্ছা নাকি ?"

চপলা উত্তর দিল, "বর যেই হউক, সে তো নিজের চেয়ে পর। নিজের রোজগারের ধন পরকে কেন দিতে যাইব। এ সময় মতে আমিই পরিব।"

হরিসিংহের তত্ত্বাবধানে নগর এরূপ সুরক্ষিত ছিল যে, তাহা আক্রমণ করা দূরে থাকুক, ভিতরের সংবাদসংগ্রহই বহুদিন

ধরিয়া ঘটিয়া উঠিল না। যখন হামিরের চরবৃন্দ অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে বিফলমনোরথ হইল, চপলা ভাবিল সেই বা কিছু না করিবে কেন? কিন্তু নগরপ্রবেশের অগ্রে সেনাপতির সহিত দেখা করাটা খুব কর্ত্তব্য, কি জানি ভিতর হইতেই যদি কোন ফন্দী খাটান যায়। জলধরের সহিত সাক্ষাৎ করাও এদিকে মহা মুস্কিলের কথা। জলধর এক প্রকার চপলার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া থাকিতেই চেষ্টা পাইতেন। আবার সাক্ষাৎ করিলে অনুমতি পাওয়াও সুকঠিন। জলধর তাহাকেই বা এরূপ বিপদের কাজে ব্রতী হইতে দিবেন কেন। সেইজন্য চপলা ছদ্মবেশেই জলধরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু শত পরিচিত চক্ষুর সম্মুখে শিবিরমধ্যে সাক্ষাৎ করিলে ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা, সেইজন্য কৌশলে জলধরকে নিভৃতে ডাকিয়া চপলা সকল দিক সারিয়া লইল।

দ্বারস্থ প্রহরীরা তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে না পারে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায়ও চপলা নির্দ্ধারণ করিতে ভুলে নাই। তাহারই পরামর্শ মত তাহার সুপরিচিত কয়েকজন সৈনিক দূর হইতে পূর্ব্ববর্ণিত আলোকাদির দ্বারা প্রহরীদিগের চিত্তে শঙ্কা জন্মাইয়া দিয়াছিল। প্রাসাদের ভিতরে যে স্ত্রীলোকের সহিত তাহার রহস্যময় আলাপ পরিচয় হয়, তিনি সেই গায়কসিমন্তিনী শান্তা। চপলা শান্তার নিকট হইতে অনেক বিবরণ জানিতে পারে। যে পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষের সাহায্যে চপলা শিবানীকে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পরে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইবে। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, চপলা ফুলওয়ালীর

বেশে যখন প্রাসাদাভিমুখে গমন করিতেছিল, সেই সময় শান্তা উক্ত পোষাকটি লইয়া শিবানীকে দিতে যাইতেছিলেন।

চপলার সহিত সাক্ষাতের পর শান্তা সেদিন আর শিবানীর নিকট যাইলেন না। চপলার দ্বারাই পোষাকটি পাঠাইয়া গৃহে ফিরিলেন। চপলা সে পোষাক লইয়া কি করিয়াছিল, তাহা কতক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা নিজের নিকটে রাখিয়া পরেই বা কোন কাজে তাহা লাগাইতে পারিয়াছিল কি না ক্রমে জানা যাইবে। ভাল কথা, চপলা নিজের বর্ণ টা বহুরূপীর মত কি প্রকারে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল? শিবানীর কক্ষে শ্যামাঙ্গী ফুলওয়ালী কি প্রকারে গৌরকান্তি রাজকুমার হইয়া দাঁড়াইল? চপলা তাহার পিতার নিকট হইতে অনেক গাছ-গাছড়ার ভৈষজ্য ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল সুতরাং ফুলওয়ালী সাজিবার ছদ্মবেশটা আরো মানানসই করিবার কল্পনায় ও বিশেষতঃ জলধরকে ফাঁকি দিবার জন্য সে অনায়াসেই তাহার অনাবৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছু শ্যামবর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই বর্ণটা ধৌত করিয়া ফেলাই চপলার স্নানাগারে প্রবেশের প্রধান উদ্দেশ্য।

নবম পরিচ্ছেদ।

শিবানীর সহিত সাক্ষাতের পর চপলা সে রাত্রি শান্তার গৃহেই যাপন করিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আবার ভিন্নতর সাজে ফুলের ডালা মাথায় করিয়া বাহির হইল। প্রহরীরা কোথায় কে কোন ভাবে থাকিয়া কি কাজ করিতেছিল, চপলা চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহা যতদূর সম্ভব মনের ভিতর গাঁথিয়া রাখিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শত্রুপক্ষের অনেক উদ্দেশ্য ধরা পড়িল। সর্ব্বত্রই যে সকলে সজাগ ও সতর্ক তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। কিন্তু জনসাধারণ যে হামিরের বিশেষ পক্ষপাতী তাহা আগেই সে জানিত, এখনও বেশ অনুভব করিল। চপলা সেদিনকার মধ্যাহ্নটাও শান্তার কাছেই কাটাইল। পরে গোধূলির ছায়া ধরণীতে সমাকীর্ণ হইলে, সে বিশ্রামস্থান হইতে বাহির হইয়া প্রথমে শিবানীর সহিত একবার দেখা করিল। কিন্তু প্রাসাদমধ্যে সে বেশীক্ষণ অতিবাহিত করিল না। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাহার নিকট মহা মূল্যবান, বৃথা আলাপে তাহা নষ্ট করিবার নহে। শিবানীর সহিত নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই একটা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরামর্শ মাত্র করিয়াই চপলা বিদায় গ্রহণ করিল।

চপলা অতি দুরূহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। অতি চতুর ও বুদ্ধিমান পুরুষেরও তাহাতে হাত দিতে আশঙ্কা হয়। কিন্তু চপলা সামান্যা কুলবধূ নহে। গৃহের ক্ষুদ্র প্রাচীরের মধ্যে সে

পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার জীবন অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়। বিচিত্র স্থানে, বিচিত্র অবস্থায়, বিচিত্র সংসর্গে তাহার শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কার সাধিত, অনুসৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। ভয় কাহাকে বলে, সে বড় জানিতই না। নানা স্থানে, নানা লোকের, নানা কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া তাহার পর্য্যবেক্ষণশক্তিও সমধিক প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। এখন যে কার্য্যের ভার সে লইয়াছিল, অবশ্য ইহা তাহার পক্ষে নিতান্ত নূতন। কিন্তু নূতন হইলেও ইহার সাধনযোগ্য ক্ষমতাও তাহার যথেষ্টপরিমাণে ছিল। প্রয়োজনের আধিক্য হেতু এক্ষণে সে সেই ক্ষমতার পূর্ণ ও যথাযথ ব্যবহার করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না।

শত্রুর দুর্গমধ্যে ছদ্মবেশই এখন তাহার একমাত্র অবলম্বনীয়, প্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া চপলা ফুলওয়ালীর বেশেই যেন পুষ্পচয়নার্থ নগরের প্রান্তস্থিত উদ্যানের দিকে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন নগরপ্রাচীরের পার্শ্বস্থ উদ্যানভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল, চপলা তখন ডালা হইতে একটা ছোট ধনুক ও তদনুযায়ী তীর বাহির করিল। তৎপরে সেই তীরের মাথায় কাগজের মত কি একটা বাঁধিয়া তাহা ধনুকে সংযোজনপূর্ব্বক উর্দ্ধে এরূপভাবে নিক্ষেপ করিল যে, তীর আর ভিতরে ফিরিয়া আসিল না, ঠিক প্রাচীরের অপর পার্শ্বে গিয়া পড়িল। ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে যখন বাহির হইতে একটা তীর আসিয়া ভিতরে পড়িল, তখন চপলা সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

চপলা উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া পুরীর একটা দ্বারের

নিকট সমুপস্থিত হইল। এই দ্বারের অনতিদূরে একটি বৃহৎ বৃক্ষের মূলে ভ্রমণকারীদিগের বিশ্রামার্থ কাষ্ঠাসন পাতা ছিল। তথায় বসিয়া চপলা যেন কোন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মালদেবের জ্যেষ্ঠাত্মজ বনবীরের উপর এই দ্বারের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত ছিল। সমাগত রজনীযোগে কিরূপ ভাবে নগর-রক্ষার কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তাহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য বনবীর ঘুরিতে ফিরিতে এই সময় সেই দ্বারের নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পরিদর্শন শেষ হইবামাত্র, পুরীর যে দিকে বন্দীরা থাকিত, সেই দিক হইতে একটা বিষম গণ্ডগোল উত্থিত হইল। রক্ষীবর্গ সকলেই কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বনবীর দ্রুতপদে কোলাহল লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। চপলা যে উদ্দেশ্যে বসিয়া ছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহার সফলতা অতি সহজেই মিলিয়া গেল।

চপলা বনবীরের গতিবিধি ও চলনভঙ্গী সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিল। চপলার অনুকরণপটুত্ব অসাধারণ, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার কাজে সন্দেহমাত্র করিতে পারে নাই। এবারেও সে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল। তাহার ডালায় লুক্কায়িত পুঁটলী হইতে এক্ষণে সে সেই শিবানীর প্রদত্ত পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ বাহির করিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা বনবীরের পরিচ্ছদাদির ঠিক অনুরূপ। বনবীর প্রায়শঃ এইরূপ বেশেই পুরীপরিদর্শনে বহির্গত হইতেন। ইহা দ্বারা চপলা একবার শিবানীকে পর্য্যন্ত চমকাইয়া দিয়াছিল। এক্ষণে যখন চপলা তাহা পরিধান করিয়া বৃক্ষতল ছাড়িয়া বাহিরে আসিল, তখন তাহাকে দ্বিতীয় বনবীর ভিন্ন আর কিছুই মনে হইল না।

একটু পরিভ্রমণের পর চপলা ক্ষিপ্রবেগে অথচ অবিচলিত গতি ও ভঙ্গীতে দ্বারের নিকটে আসিল। ঠিক বনবীরের স্বরে দ্বাররক্ষককে জানাইল যে, তাঁহার পিতা মালদেব নগর-রক্ষার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা এই দ্বারের নিকট সমুপস্থিত, শীঘ্র তাহা খুলিয়া দিতে হইবে। যখন বনবীরের আদেশ, তখন দ্বাররক্ষক কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব না করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। শরের দ্বারা প্রেরিত পত্রানুসারে জলধর কতক সৈন্য লইয়া এই স্থানে লুক্কায়িত ভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিছু পরেই অবারিত দ্বারপথে জলধর বন্যার প্রবাহের ন্যায় সসৈন্যে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের প্রহরীদল সেই প্রবাহে তৃণখণ্ডের মত কোথায় ভাসিয়া গেল। কিন্তু হরিসিংহ সুপ্ত ছিলেন না। তাঁহার কর্ণে এই দুঃসংবাদ পৌঁছাইতেই তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই দুরতিক্রম্য বাঁধের মত সেই প্রবাহের মুখে সদলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

একণে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, উভয় পক্ষই তাহাতে প্রাণপণে লাগিল। হরিসিংহ যে এত শীঘ্র এরূপ বাধা দিতে পারিবেন, জলধর তাহা ভাবেন নাই। জলধর তাঁহার সৈন্যের কিয়দংশ লইয়া আসিয়াছিলেন, সমগ্র আনিবার সময় পান নাই।

অপ্রস্তুত অরাতিকে উহাতেই কায়েদা করিতে পারা যাইবে, এরূপ আশাও পোষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সংখ্যায় হরিসিংহের সৈন্য অবশ্য অধিকতর। তবে ইহার কতক অংশ অন্তরে হামিরেরই পক্ষপাতী যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া বিরোধে প্রবৃত্ত। এই দায়গ্রস্তদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও অবশিষ্টের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। জলধরের সৈন্যের খুবই সমকক্ষ।

জলধরের সৈন্যের সকলেই যেমন হামিরের এবং চিতোরের উদ্ধারার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, অপরদিকে হরিসিংহেরও এইরূপ একদল দৃঢ়ব্রত লোক ছিল। ইহারা রাজ্যের মঙ্গল নিজেদের স্বার্থবুদ্ধির নিকট বলি দিয়াছিল। ধর্ম্ম ও নীতির শীর্ষে পদার্পণ করিয়া উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা বুঝিত যে, মালদেবের পতনের সহিত ইহাদেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই ইহারাও যুদ্ধে একাগ্রচিত্তে লাগিল। সেই শুক্লপক্ষীয়া রজনীর অন্ধকারমিশ্রিত আলোকে বা আলোকমিশ্রিত অন্ধকারে শত শত অসির ঝনঝনা উঠিল। কি ম্লান জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রাঙ্গণ, কি অল্প অন্ধকারময় তরুতল সকল স্থানই যুদ্ধের সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিল।

অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিয়াছে, তবু কোন পক্ষ পদমাত্র হঠিতেছে না। উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে। কেহ জ্যোৎস্নায়, কেহ ছায়ায় চিরতরে নয়ন মুদিয়াছে। রুধিরে শুষ্ক ভূমি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই নহে, স্থানে স্থানে আনত বৃক্ষশাখা ও সমীপবর্ত্তী প্রাচীর-গাত্র অবধি রক্তের ছিটায় রঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের তিলমাত্র বিরাম

নাই। জলধরের সৈন্য যে স্থলে বাধা পাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, প্রায় সেইখানেই রহিয়াছে, কিঞ্চিৎ মাত্রই অগ্রসর হইতে প্যারিয়াছে। হরিসিংহের সৈন্য যে দিকে ছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত উচ্চ—তাহাদের বাধা দিবার অনেক সুবিধা হইতেছিল। চিতোরভক্ত অনেক বীর শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজেদের পথ পরিষ্কৃত করিতে প্রয়াস পাইল, কিন্তু প্রাণ দিয়াও তাহা সাধন করিতে পারিল না।

সহসা এই সময় এক ভীমকায় অশ্বারোহী, জলধরের সৈন্য যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিল। আগন্তুক অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ুবৎ হরিসিংহের সৈন্যের উপর আপতিত হইল। কে এ অশ্বারোহী? মানুষের বাহুতে এত বল? তরবারিখানা যেন যমের দণ্ডের ন্যায় ঘুরিতেছে আর প্রতি আঘাতে শত্রুর ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তাহার প্রচণ্ড প্রতাপের মুখে কোন বাধা দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সর্ব্বাঙ্গে শোণিত মাখিয়া প্রচণ্ড অস্ত্রখানা যেন ভৈরব তাণ্ডবে মত্ত, কাহার সাধ্য তাহার সে সংহার-নৃত্য ভঙ্গ করে। হরিসিংহ দূর হইতে ইহা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। সহচরদিগকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিলেন। নিজেও সেই আগন্তুকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্যম বিফল হইল। সেই দুর্দ্দমনীয় শক্তির সম্মুখে তাঁহার দল হঠিতে লাগিল। এক পা দুই পা করিয়া বিশ হাত পিছাইয়া পড়িল। সেই আগন্তুকের পশ্চাতে ও পাশে জলধরের সৈন্যদলও যেন প্রবল ঝঞ্ঝাতাড়িত সাগরের ন্যায় ক্ষেপিয়া উঠিল। দিগন্ত

কাঁপাইয়া হামিরের সৈন্যদল হইতে নির্ঘোষ উত্থিত হইল—"জয় মহারাণার জয়।"

হরিসিংহ দেখিল, আর রক্ষা নাই। সে দুর্জ্জয় উত্তেজনার পুরোভাগে তাহার সৈন্যেরা আর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। ক্রমে তিনি আগন্তুকের অনেকটা নিকটে আসিয়াছিলেন। এবার সুস্পষ্ট চিনিতে পারিলেন। তাঁহার মনের অবশিষ্ট শক্তি ও সামর্থ্যের উপর যেন এক অবহনীয় বিস্ময় ও নৈরাশ্যের ভার চাপিয়া বসিল। হরিসিংহ দেখিলেন, এ যে আর কেহ নহে, এ যে সেই বিক্রমকেশরী হামির! তাঁহার এত যত্নে বাঁধা পাশ ছিঁড়িয়া, পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া এক্ষণে তাঁহার সম্মুখে কৃতান্তের ন্যায় সমুপস্থিত। ভীত ও ভগ্নচিত্তে এবার হরিসিংহ সদলে পৃষ্ঠ দেখাইলেন। তখন সেই পলায়নপর অরাতিদলকে অপর পক্ষ কোমল উদ্ভিদ্‌বৎ পাতিত করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিলে হামির সেই শত্রুদল প্রায় সমূলে নিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি উচ্চকণ্ঠে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"ভীত ও পলায়নপরের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিও না।"

ঊর্দ্ধোত্থিত কৃপাণ নিশ্চল হইল। বীরের প্রতাপে যেমন শত প্রাণ দেহ মুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার করুণায় সহস্র প্রাণ আশু মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই রজনীর অবসানে চিতোর জাগিয়া দেখিল, তাহার চরণ হইতে অনেক দিনের শৃঙ্খল খসিয়া গিয়াছে। যে মৃত্যুর ছায়া অহর্নিশ তাহাকে ঘেরিয়া ছিল, আজ নবীন আলোকে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। আজ নিয়তিরও নয়নে সে করাল বক্র ভ্রূকুটি নাই, তাহা প্রসাদের মৃদুহাস্যে উৎফুল্ল।

নব উত্তেজনার সহিত মহা উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। আজ যেন বিমুক্ত বাতাসে নাগরিকগণ নূতন প্রাণের আস্বাদ পাইয়াছে। আনন্দের হিল্লোলে নিয়মবদ্ধ প্রাত্যহিক কর্ম্ম ভাসিয়া গিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে আনন্দের উৎস ছুটিয়াছে। বাদ্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে চারিদিক টলমল করিতেছে।

আজ শরীরে নূতন বসনভূষণ ঝকমক করিতেছে, হৃদয়ে নূতন উৎসাহ ফুলিয়া উঠিতেছে, বদনমণ্ডলে নূতন জ্যোতি খেলিতেছে। আজ যেন নিয়ম নাই, গণনা নাই, বাধ্যতা নাই। সকলেই উচ্ছ্বসিতপ্রাণে আনন্দসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে। আজ গৃহে আনন্দ, পথে আনন্দ, কর্ম্মে আনন্দ, অবসরে আনন্দ—প্রতি ব্যাপার, প্রতি ঘটনা অপার আনন্দময়।

আজ উচ্চ নীচ বিরোধ নাই, ধনী দরিদ্র প্রভেদ নাই। যে যেখানে যাহাকে পাইতেছে, সে সেখানে তাহাকে লইয়া আনন্দ করিতেছে। আজ প্রভু ভৃত্যকে শাসন করিতেছে না, উত্তমর্ণ অধমর্ণকে চক্ষু রাঙ্গাইতেছে না, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টকে অবজ্ঞা করিতেছে না। সকলেই যেন এক মহা পথে হাত

ধরাধরি করিয়া এক মহা আনন্দের মেলায় চলিয়াছে। ভুল-ভাঙ্গা বিশ্বাসের মত, কূলভাঙ্গা নদীর মত, নূতন প্রেমরাগে রাঙ্গা হৃদয়ের মত সকলেই যেন উদ্দাম উন্মুক্ত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আজ বিষয়কর্ম্ম বন্ধ, বিষয়ীরা ও কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ কাজের বোঝা নামাইয়া নানা রঙ্গরসে মাতিয়াছে। বিদ্যালয় বন্ধ, বিদ্যার্থীরা অধ্যাপকের তাড়না ভুলিয়া নানা ক্রীড়ায় রত রহিয়াছে। রন্ধনাদিও বন্ধ, স্ত্রীলোকেরা কেবল হুলু দিতেছে, ফুল ছড়াইতেছে ও রং মাখিতেছে।

গায়ক অনেক দিনের রুদ্ধকণ্ঠ খুলিয়াছে, পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মত সাতটা সুর দিগ্বিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। নর্ত্তকের নাচিতে নাচিতে কোমর ভাঙ্গিয়া গেল, তবুও বিরাম নাই, কেবলই নাচ আর নাচ। বকিতে বকিতে বক্তার মুখে ফেনা উঠিল, কথা তবু কি ফুরায়! সে যেন অসীম অনন্ত অপার সাগরের মত। সমস্ত পুরীটা যেন এতদিন মূকের মত বসিয়াছিল, আজ যেন বাক্‌শক্তি পাইয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবার জন্য শতমুখে শব্দস্রোত ঢালিতেছে।

কেবল বাণীদেবীই আজ সুপ্রসন্না নহেন, লক্ষ্মীও আজ মুক্তহস্তা। দাতা যেন আজ শতহস্তে দান করিতেছে। বিচার নাই, জিজ্ঞাসা নাই, ভেদাভেদ নাই। যে চাহিতেছে সেই পাইতেছে, যে চাহিতে পারিতেছে না, তাহারও হাতে অযাচিতভাবে গিয়া পড়িতেছে। আজ ধনী তাহার বহুযত্ন-সঞ্চিত ধনরাশি অকাতরে ছড়াইতেছে। এমনি কি যাহার কৃপণতা প্রবাদসিদ্ধ, সেও আজ তাহার থলির মরিচাধরা বন্ধন খুলিয়াছে। আজ একটা বিপর্য্যয়-কাণ্ড অভিনীত

হইতেছে। যে অত্যন্ত গম্ভীর, কথন হাসে না, সেও হাসিয়া ফেলিয়াছে। যে অত্যন্ত অপরিষ্কৃত, কথন স্নান করে না, সেও আজ মাজিয়া ঘসিয়া সৌখীন হইয়া বাহির হইয়াছে। যে অত্যন্ত শান্ত, এক স্থানেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সেও উঠিয়া লাফাইতেছে। কথনও যে খেলে না, সেও খেলিতেছে, কথনও যে গায় না, সে গায়িতে না পারিলেও চীৎকার করিতেছে। যাহার পক্ষে যাহা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক, তৎকর্তৃক তাহাও অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আজ স্বার্থের বেড়া ভাঙ্গিয়া হৃদয়খানা ভারি প্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে। হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতাকে যেন গলা ধাক্কা দিয়া সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খুঁটিনাটি ময়লামাটি সব ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া গিয়াছে। আজ শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই, আপন পর প্রভেদ নাই। যাহাদের মধ্যে অহি-নকুলের সম্বন্ধ ছিল, তাহারাও হাসিমুখে কোলাকুলি করিতেছে। কাল প্রদোষে যে শত্রুর বিরুদ্ধে বিষম ষড়যন্ত্র আঁটিয়া শয়ন করিয়াছিল, আজ প্রভাতে সে শত্রুর হাত ধরিয়া মহোল্লাসে আদর আপ্যায়ন করিতেছে। বংশ-পরম্পরাগত, বর্দ্ধমান, ক্রমপুষ্ট বিরোধের আজ যেন সহসা মৃত্যু ঘটিল। স্বর্গের সৌরভে বহুদিনের পূতিগন্ধ ডুবিয়া গেল।

চারিদিকে নূতন সাজ, নূতন সজ্জা। দ্বারে দ্বারে মালা দুলিতেছে। তোরণে তোরণে পতাকা উড়িতেছে। পথ, ঘাট, উদ্যান, প্রান্তর চারিদিকই শোভাময়। হর্ম্মশ্রেণীর শিখরে শিখরে সুবর্ণখচিত নিশান খেলিতেছে। গবাক্ষে গবাক্ষে সুন্দরীদের বেশভূষা ও তৎসহ আনন্দোজ্জ্বল কটাক্ষ চমকিতেছে। প্রাঙ্গণে

প্রাঙ্গণে দাসদাসী বালকবালিকাদের মেলা বসিয়াছে। তাহাদের বিচিত্র-বর্ণ পরিচ্ছদের উপর রবির কিরণ হাসিতেছে। জয়োন্মত্ত সৈনিকের কোলাহলে, নৃত্যগীত ও বাদ্যের রোলে এবং সকলের মিলিত গণ্ডগোলে সমগ্র পুরীটা যেন কানায় কানায় ভরা নদীর মত ভরিয়া উঠিয়াছে।

কেন এ উত্তেজনা? কিসের এ আনন্দ? চিতোর—সাধের চিতোর, রাজবারা-আকাশের পূর্ণচন্দ্র আজ রাহুমুক্ত। বিধাতার কি দারুণ অভিশাপই তাহাকে লাগিয়াছিল! আজ সে অভিশাপ ঘুচিয়াছে। প্রবলপ্রতাপ মহাবীর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জড়পিণ্ডের ন্যায় পড়িয়াছিল, আজ সে নিজের শক্তি এবং স্বাস্থ্যে পুনরায় উন্নতশীর্ষে দাঁড়াইয়াছে। তাহার ললাটদেশের ঐ অপূর্ব্ব মহিমজ্যোতি—কি দুর্দ্দৈবশতঃ তাহা আবৃত হইয়াছিল—আজ আবার দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কেন এ উত্তেজনা, কিসের এ আনন্দ? আজ পুণ্যশ্লোক লক্ষ্মণসিংহের পৌত্র তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসনে আরূঢ়। যে সিংহাসন অমরকীর্ত্তি অমিততেজা বীরগণের স্পর্শপূত, তাহা দুষ্কৃতকারীর অনাচারে কলঙ্কিত হইয়াছিল। আজ তাঁহাদের বংশের প্রদীপ বীরশ্রেষ্ঠ হামির সে কলঙ্ক ঘুচাইলেন। চিতোরের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার নৃপতিগণ বুঝি স্বর্গেও কাঁদিতেছিলেন, আজ তাঁহাদের অশ্রু মুছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন সামন্তগণ কি নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইবেন?"

পূর্ব্ববর্ণিত উৎসবের শেষে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিবার অগ্রে হামির, জলধর ও সন্ন্যাসী নিভৃতে একটা পরামর্শ করিতেছিলেন। জলধর প্রথমে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। হামির একটু ভাবিতে লাগিলেন, সহসা কিছু উত্তর দিলেন না।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি সামন্তগণের উকিল হইয়া আসিয়াছ?"

জলধর কহিলেন, "হাতে কাজ তো এখন কিছু নাই, মিছামিছি আটকাইয়া রাখা কেন?"

সন্ন্যাসী। অন্যের কথা যাহাই হউক, তোমার তো কিছুতেই ছুটি নাই।

জলধর মৃদুহাস্যে বলিলেন, "আমার ছুটি না হয় আমার জীবনের ছুটির সঙ্গেই দিবেন।"

কথাটা বলিতে জলধর হাসিলেন বটে, কিন্তু এই হাসির সঙ্গে একটা যেন অব্যক্ত নৈরাশ্যের সুর মিশান রহিল। সন্ন্যাসী বুঝি তাহা লক্ষ্য করিলেন। কহিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, সে ছুটি যেন খুব বিলম্বেই মিলে।"

এতক্ষণ পরে হামির বলিলেন, "জলধর, তোমার কথার উত্তর এখন ঠিক দিতে পারিতেছি না।"

জলধর বিনীতভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "প্রশ্নটা কি মহারাণার কিছু জটিল বোধ হইতেছে?"

হামির সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "গুরুদেবের কি মত?"

সন্ন্যাসী। আমি তো আকাশের কোণে একটা কাল মেঘের রেখা দেখিতে পাইতেছি।

জলধর। অবশ্য একটু মেঘ আছে বৈ কি। কিন্তু উঠিতে অনেক দেরী, সম্ভবতঃ নাও উঠিতে পারে।

হামির কহিলেন, "আমার বোধ হয়, উহা শীঘ্রই প্রলয়-মূর্ত্তি ধরিবে।"

সন্ন্যাসী। নিশ্চয়ই, এমন সোনার রাজ্য হারাইয়া কি কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে?

জলধর। তাহা অবশ্য মানি। তবে সেদিন শত্রুর শেষ রাখা ততটা সুবিধাজনক হয় নাই, সবগুলা নিকাস করিলে কাজটা কিছু নৃশংস হইত বটে, কিন্তু আপাতত সৈনিকের সাজটা ফেলিয়া দিব্য হাওয়া খাওয়া যাইত। কিন্তু যাহাই হউক, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, সেজন্য সামন্তদিগকে এখন রাখিয়াই বা প্রয়োজন কি? তাহারা তো আমাদেরই নস্য দিতে কুলাইবে না।

সন্ন্যাসী। যাহা করিয়াছ, উত্তমই হইয়াছে। পলায়নপর শত্রুকে এস্থলে বধ না করা কেবল করুণার নহে, বুদ্ধিরও কাজ। যাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছ, দেখিবে একদিন তাহাদের অনেকে আসিয়া মহারাণার পতাকার নিম্নে দাঁড়াইবে। আশঙ্কা তাহাদের নিকট হইতে তত নহে।

জলধর সহাস্যে বলিলেন, "মেঘখানা তবে বুঝি ঐ মহম্মদ খিলিজির শ্মশ্রুরাজি। তা আসুক, সেগুলোকে এবার এমন করিয়া তোয়াজ করিতে হইবে, তাহা যেন আর কখন মেঘের আকার ধারণ না করে।"

সন্ন্যাসী। হাঁ, যতদিন না দিল্লীর দিকটা ফর্সা হয়, ততদিন আমাদের একত্র থাকাই বিধেয়।

জলধর। আমি মনে করিতেছিলাম, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিতে বিলম্ব আছে। ইহার মধ্যে সামন্তগণ যদি নিজ নিজ সংসারের মুখ দেখিয়া আসিতে পারেন, আসুন না। তাঁহারা সেইরূপ একটু ইচ্ছাও করিতেছেন।

হামির হাসিয়া বলিলেন, "তোমার তো সে ইচ্ছা করিবার মূলটুকুও নাই। যদি এমন কোন মুখও চিতোরে থাকে, যাহার অধিকারিণীকে শীঘ্র সংসারে আনিতে চাও, সে মুখ হইতেও কিছুদিন বঞ্চিত থাকিতে হইবে। আমরা শীঘ্রই চিতোর ত্যাগ করিব।"

জলধর দীর্ঘনিশ্বাস রোধপূর্ব্বক মনে মনে বলিলেন, "আমি যে তাহা হইতে চিরবঞ্চিত।"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "প্রভু, ইহা এ দীনেরও বাঞ্ছনীয়। আমিও চিতোর ছাড়িতেই উদ্‌গ্রীব।"

হামির। তোমার এ ব্যস্ততা কিসে?

জলধর অবশ্য মনের অনেক কথা চাপিলেন। কহিলেন,—"কুম্ভকর্ণের যদি অকালে নিদ্রাই ভাঙ্গে, তবে তাঁহার সহিত একটু অগ্রসর হইয়াই সাক্ষাৎ করা উচিত।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তাহা তো বটেই, হাজার হউক রাজ-

পুত্র, তাঁহাকে ক্লেশ দিয়া আর চিতোর পর্য্যন্ত না আনাই ভাল।”

জলধর। কিন্তু নিদ্রাটা ঠিক এখনই ভাঙ্গিবে কি?

সন্ন্যাসী। মালদেব সে বিষয়ে চেষ্টার একশেষ করিবে। ভাঙ্গিবারই খুব সম্ভাবনা।

জলধর। তাঁহাকে এবার চিরনিদ্রার রাজ্যে পাঠাইলেই ঠিক হয়। তাহা হইলে তাঁহাকে আর জাগিবার কষ্টটুকুও ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু মালদেব এখন বিশেষ উত্তেজনা তাঁহার ভিতর প্রবেশ করাইতে পারেন, তবে না।

সন্ন্যাসী। মহারাণার শ্যালকটিও বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে।

জলধর। পুচ্ছ গুটাইয়া যখন পলাইয়াছে, তখন প্রভুর চরণ ভিন্ন আর কোথায় লুটাইবে?

হামির এবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “জলধর, তুমি বলিতেছ সামন্তগণ গৃহে ফিরিতে ইচ্ছুক। চিতোরের সেবা অপেক্ষা গৃহের সুখ কি তাঁহাদের কাছে বেশী প্রিয়তর হইয়াছে?”

জলধর। না মহারাণা, সেরূপ মোটেই নহে। আমি তাঁহাদের অন্তর বিশেষ জানি। তবে আপাতত তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়াই কেহ কেহ ঐরূপ ইচ্ছা করিতেছেন। যদি আজ তাঁহারা জানিতে পারেন, মস্ত শিকারের যোগাড় হইতেছে, তবে ঘর দুয়ার ভুলিয়া সকলে সেই দিকেই ছুটিবেন। প্রয়োজন থাকিলে গৃহের কোমল শয্যা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিন ভূমিই তাঁহারা অধিকতর পছন্দ করেন। তবে

তাঁহারা উপস্থিত কাজ চাহেন, চুপ চাপ বসিয়া রুটি ধ্বংস করিতে নারাজ।

হামির। আমাদের যাত্রা করিতে কিছু বিলম্ব আছে। যাঁহাদের গৃহ নিকটে তাঁহারা শীঘ্র একবার ঘুরিয়া আসিতে পারেন। আমি স্বয়ং সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।

জলধর। সংগ্রামের গন্ধ পাইলে, তাঁহারা কেহই আর যাইতে চাহিবেন না। দিল্লীশ্বরের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহারা সকলেই বড় উদ্‌গ্রীব। তাঁহাদের প্রাণের বাসনা— কবে বিধি তাঁহাদের এমন সৌভাগ্যশালী করিবেন। চিতোরের চরণে একটি কণ্টকও থাকিতে তাঁহারা সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবেন না। জয়শ্রীর মুখে সামান্য চিন্তারেখাও তাঁহাদের অসহ্য। সে মুখ আবার পূর্ব্ববৎ সহাস্য হউক, জ্যোতির্ম্ময় হউক, চিরপ্রসন্ন হউক। আবার শান্তি, সুখ ও স্বাস্থ্যে মিবারভূমি মুক্তির অম্বরতলে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকুক। প্রভু, ইহাই তাঁহাদের কামনা। আর এই কামনার অনুযায়ীই তাঁহাদের সাধনা।

হামির উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে কহিলেন, "ইহা রাজপুতেরই সাধনা।"

সন্ন্যাসী ভক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "যিনি ন্যায়ের রক্ষণ ও অন্যায়ের বিলোপ করেন, যদি দৃঢ় সঙ্কল্প থাকে, তাঁহারই চরণে এ সাধনার সিদ্ধি মিলিবেই মিলিবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গভীর অরণ্যমধ্যস্থ এক বিস্তৃত অবকাশস্থানে অসংখ্য তাম্বু পড়িয়াছে। তাহাদের বর্ণ বিচিত্র, গঠন বিচিত্র, শ্রেণীও বিচিত্র। সেই বিচিত্র বর্ণে প্রতিফলিত সূর্য্যোলোকে পার্শ্বস্থ বনরাজি অবধি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই পটগৃহের কোনটা মহার্হ উপাদানে নির্ম্মিত, কোনটা তদপেক্ষা হীন, কোনটা অতি সামান্য। সকল তাম্বুরই শীর্ষে পতাকা উড়িতেছে—কোনটা মণিমুক্তা-স্বর্ণখচিত, কোনটা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, কোনটা সামান্য কার্পাসবস্ত্র মাত্র। তাম্বুর কোনটার ঝালরে রত্ন চমকিতেছে, কোনটার ঝালরে কেবল একটু আধটু সোনারূপার চুমকি, কোনটার একেবারে ঝালরই নাই। এইরূপ বিচিত্র তাম্বুর ভিতরে বিচিত্রবেশ, বিচিত্রভূষণ অধিবাসিগণ বিচিত্র কার্য্যে নিরত!

ইহাদের সকলের সহিত এখন আমাদের পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। একটি বিশেষ তাম্বুর মধ্যস্থ একটি বিশেষ লোকই, এখন আমাদের বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই তাম্বু সর্ব্বোচ্চ ধরণের না হইলেও, নিতান্ত সাধারণ নহে। ইহার অভ্যন্তরস্থ মানুষটিও উহারই মধ্যে অবশ্য একটু অসাধারণ। ইনি রাজপুত বটেন, কিন্তু রাজপুতোচিত তেজস্বিতা ইহাঁর মুখে নাই। ইহাঁর বেশও রাজপুত সেনাধিপের মত বটে, কিন্তু তাহা পাঠান প্রভুর প্রসাদচিহ্নে নানাভাবে চিত্রিত। ইহাঁর শিরে, ইহাঁর বক্ষে, ইহাঁর বাহুতে সেই চিহ্নের ছাপ উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। কে ঐ বিচিত্রবেশী? ইনি আর কেহ নহেন, ইনি সেই চিতোরাধিপতি

মালদেব। কিন্তু সেই চিতোরপতিত্ব এখনও তাঁহার আছে কিনা, এই সন্দেহে বুঝি তাঁহার মুখখানি বড় শুষ্ক।

মীরদিগকে দমন করিয়া বড় আনন্দে মালদেব গৃহে ফিরিতে-ছিলেন। অকস্মাৎ পথিমধ্যে হরিসিংহের প্রেরিত চিতোরাবরোধের সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রবৎ মালদেবের কর্ণমূলে পতিত হইল। মালদেব ভীরু না হইলেও, হরিসিংহের ন্যায় দুঃসাহসী ছিলেন না। নিজের শক্তিতে পাছে না কুলায়, এই আশঙ্কায় বিপদের সংবাদ পাইয়া তিনি সাহায্যভিক্ষার্থ দিল্লীর অভিমুখে ছুটিলেন। যথাসময়ে বাদশাহের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। অপর পক্ষের মুখে শুনা গিয়াছে, বর্ত্তমান বাদশাহ একটু নিদ্রামগ্ন লোক। সম্ভবতঃ অহিফেনের সহিত এই নিদ্রালুতার কিছু যোগও থাকিতে পারে। দিল্লীর সুখকর আরাম ছাড়িয়া দূর দেশে যাওয়ার পক্ষে তাঁহার বড় অভিরুচি দেখা যাইত না। কিন্তু কি জানি নেশার খেয়ালের মত তাঁহার মাথায় কি একটা বেয়াড়া ভাব এবার সহসা গজাইয়া উঠিল। যুদ্ধ জিনিষটা কতখানি মিঠা ও কতখানি তিক্ত তাহারই পরীক্ষার্থ বুঝি তাঁহার ইচ্ছা এবার ভারি বলবতী হইয়া দাঁড়াইল। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় পদ্মিনীরও যে আশা একেবারে ছিল না, তাহাও বলা যায় না।

সুতরাং চরণাশ্রিত মালদেবের ক্রন্দন সফল হইল। তাঁহার অদৃষ্টাকাশের পূর্ণচন্দ্র মহম্মদ খিলিজি তাঁহার প্রতি কৃপাকটাক্ষে চাহিলেন। মুলুকের অধিপতি তাঁহার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া সানুগ্রহে তাঁহার হাত ধরিয়া বাহির হইলেন। ইহাতে মালদেবের বুকখানা অবশ্য দশ হাত ফুলিয়া গেল। তথাপি ঐ গভীর চিন্তার আবেগ কেন? শত্রুর তো এখানে নামগন্ধও নাই।

মহাবল পরাক্রান্ত দিল্লীশ্বর সসৈন্যে বিরাজমান। কেবল চিতোরে পৌঁছিবেন, আর শৃগালের মত পাহাড়ীগুলাকে তাড়াইয়া দিবেন। তবে আর এত ভাবনা কিসের? কিন্তু কি জানি কোন্ অমঙ্গলের দেবতা বুঝি তাঁহার কানে কানে অন্য প্রকার বলিতেছে।

কিন্তু এই সময়ে তাঁহার চিন্তাসূত্র একটু কাটিয়া গেল। তাম্বুর দ্বারদেশ হইতে কাহার যেন অস্বাভাবিক পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। সত্যই সেই দেবতা এ কাহার রূপ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন? ছিন্ন বেশ রুক্ষ কেশ, কে এ উন্মত্ত আগন্তুক? চিতোরাধিপের দুর্দ্দান্তপ্রতাপ পুত্র কুমার হরিসিংহ? মালদেব আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। একবার নয়নদ্বয় হস্তের দ্বারা মুছিলেন। ঐ যে সত্যই হরিসিংহ তাঁহার চরণ-প্রান্তে ধূলিধূসরিত। মালদেব এবার পুত্রকে ধরিয়া সস্নেহে বসাইলেন। আপনিও তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়েই নীরব রহিলেন, কাহারও মুখ হইতে শব্দমাত্র ফুটিল না। হরিসিংহ কি বলিবেন? তিনি যে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন—এ দারুণ সংবাদ কেমন করিয়া দিবেন? মালদেব কি জিজ্ঞাসা করিবেন? হরিসিংহ স্বয়ং যে মূর্ত্তিমান অমঙ্গলের ন্যায় তাঁহার সকাশে সমুপস্থিত। কিন্তু তাঁহাকেই প্রথমে এই নীরবতা দূর করিতে হইল। মালদেব সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন,—

"বৎস, এমন কি বিপদ হইয়াছে, যাহার প্রতীকার এখন আমাদের সাধ্যাতীত?"

হরিসিংহ হতাশভাবে উত্তর দিলেন, "প্রতীকার সাধ্যাতীত কিনা জানি না, কিন্তু বিপদের চূড়ান্ত হইতে বাকি নাই।"

মালদেব আত্মীয়বর্গকে লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিতস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাদের সকলের তো শারীরিক কুশল ?"

হরিসিংহ। সকলে বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু মরাই ভাল ছিল।

মালদেব। কেন বৎস, এত আক্ষেপ করিতেছ ? জীবন অপেক্ষা কি বড় ?

হরিসিংহ। জীবন অপেক্ষা জীবনের সুখ বড়। তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।"

মালদেব। আশ্বস্ত হও, সুখ আবার পাইবে।

হরিসিংহ ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "চিতোর না পাইলে আর সুখ পাইব কোথায় ?"

মালদেব শিহরিয়া কহিলেন, "তবে কি চিতোর শত্রুর হাতে গিয়াছে ?"

হরিসিংহ এবার পূর্ব্ব ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মালদেব বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। বর্ত্তমান অশুভ যে এতটা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। কিন্তু ইহাতে মালদেব একেবারে দমিলেন না। তাম্বুর গবাক্ষপথে বাদশাহের মণিমুক্তারত্নোজ্জ্বল শিবিরচূড়া দূর হইতে তাঁহার নয়নে পড়িল। ভীমদর্শন তাতারসৈনিকের উল্লাস-কোলাহল তাঁহার কর্ণে আসিল। তৎপ্রতি হরিসিংহের মন আকৃষ্ট করিয়া কহিলেন,—

"যাহাই হউক, এক্ষণে আমাদের সঙ্গে ঐ মূর্ত্তিমতী আশা।"

হরিসিংহের স্মৃতিতে হামিরের অসুরবীর্য্য অক্ষুণ্ণভাবে জাগিতেছিল। তিনি পিতার ধারণার সঙ্গে ততটা সহানুভূতি করিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন,—"হইতে পারে।"

মালদেব। সে কি! আমরা যে পরিণামে জয়ী হইব, ইহাতে তোমার অনুমাত্র সংশয় আছে নাকি?

হরিসিংহ। ভবিষ্যতের কথা ভবিতব্যতাই জানে। তবে চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটি হইবে না।

পরে বক্ষে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "এখানে যে অনল জ্বলিতেছে, কে বলিতে পারে শত্রুর কতখানি রক্তে তাহা নিভিবে।"

মালদেব বিষয়ান্তর পাড়িয়া কহিলেন, "শত্রুকে দ্বার খুলিয়া দেওয়া! বন্দীকে মুক্ত করা! কি বিষম ষড়যন্ত্র! ভাল দ্বার-রক্ষায় অবশ্য খুব বিশ্বাসী লোকই নিয়োগ করিয়াছিলে?"

হরিসিংহ। সে বিষয়ে অন্যথা হয় নাই।

মালদেব। তবে এ কার্য্য করিল কে? কিছু সন্ধান মিলিয়াছে কি?

হরিসিংহ। প্রথমটা স্পষ্টই জানা গিয়াছে। অপর কার্য্যও যে সেই একই লোকের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

মালদেব। তবে সে কথা বলিতে আর ইতস্ততঃ কিসের?

হরিসিংহ। বলিলে আপনার বিশ্বাস হইবে না।

মালদেব। কোন দিন তোমার কোন কথায় অবিশ্বাস করিয়াছি?

হরিসিংহ। করেন নাই। এবারে করিবেন। মিথ্যা বিদ্বেষ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন।

মালদেব বিস্মিতভাবে কহিলেন, "তোমার অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কে? কাহার প্রতি অনুরাগবশে তোমাকে পর্য্যন্ত মিথ্যাবাদী ভাবিব?"

হরিসিংহ এবার যেন কিছু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "এমন লোক আছে, মহারাজ।"

মালদেব ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন, "যদি থাকে, সে আমার চিন্তারাজ্যের সীমাতীত।"

হরিসিংহ। মহারাজ, বড় শক্ত কথা মুখে আনিতেছি, ক্ষমা করিবেন। সে আর কেহ নহে, আপনারই প্রিয়তম জ্যেষ্ঠাত্মজ।

বাস্তবিক হরিসিংহের কথায় মালদেবের হৃদয়ে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল। মালদেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"কি বলিলে ?"

হরিসিংহ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "যাহা বলিয়াছি, তাহা সেই অপরাধীরই বিশেষ প্রিয়পাত্র এমন দশ জনের কথায় প্রমাণ করিব।"

মালদেব নীরবে রহিলেন। বিশ্রামার্থ হরিসিংহ অন্যত্র প্রেরিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিসিংহের শিবিরত্যাগের পর মালদেবের বদনমণ্ডল যেন গাঢ় বিষাদ-কালিমায় মলিন হইয়া গেল। কি যেন এক দারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় নিপীড়িত হইতে লাগিল। মালদেব আসন হইতে উত্থিত হইলেন। বক্ষের উপর হস্ত চাপিয়া নতমুখে পদচারণা করিতে লাগিলেন। উন্মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া সায়াহ্নের ম্লান সূর্য্যালোক শিবিরের অভ্যন্তরে

আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোকের উপর ইত্যবসরে যে একটি মনুষ্যের ছায়া নিপতিত হইয়াছে, তাহা চিন্তামগ্ন মালদেবের নয়নে প্রথমে লক্ষিত হইল না। ছায়া দ্বারের ভিতরদিকে দুই এক পদ আসিয়াই যেন থমকাইয়া দাঁড়াইল। এই সময় মালদেবের কণ্ঠ হইতে অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত হইল,—

"বনবীর কি এতদূর বিশ্বাসহন্তা!"

দ্বারস্থ স্থির ছায়া অমনি দুলিয়া উঠিল। উত্তর আসিল, "ইহাও কি মহারাজের বিশ্বাসযোগ্য?"

ধীরে ধীরে বনবীর শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পিতৃপদে প্রণত হইলেন। মালদেব স্নেহাবেগে প্রিয় পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ হাত সরাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"কাহাকে স্পর্শ করিলাম। সেই অমৃত কি এমন গরলে পরিণত হইল?"

নিজের সম্বন্ধে যে বিষম কুৎসা রটিয়াছে, বনবীর পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাইয়াছিলেন এবং হরিসিংহই যে এই রটনার মূলে বর্ত্তমান, ইহাও অনুমান করিয়াছিলেন। মালদেবের কথার প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—

"সে যাহা তাহাই আছে। তবে যদি কেহ তাহাকে পিতৃবক্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়া পদদলিত করিতে চায়, তবে সে অপরাধ কাহার স্কন্ধে পড়ে? আপনি দেশের রাজা, বিচারক, যাহার দোষ নাই, তাঁহাকে কেন দোষী মনে করিতেছেন?"

মালদেব ক্ষোভে ও হতাশায় কর্কশস্বরে কহিলেন, "কে রাজা বনবীর? আমি? দেশের রাজা আমি এখনও কতক থাকিতে

পারি, কিন্তু তোমার রাজা নহি। তুমি নূতন রাজার অনুরাগী প্রজা। এমন রাজভক্তি কোথায় শিখিলে?"

বনবীরও ক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যদি অপরাধীই স্থির করিয়া থাকেন, তবে শুধু এ বাক্যশেলেরই বা বৃথা প্রয়োগ কেন? রাজদ্রোহীর সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।"

এই বলিয়া বনবীর নিজের অস্ত্রাদি উন্মোচনপূর্ব্বক মালদেবের চরণতলে রক্ষা করিলেন। মালদেব এবার কিছু সংযত ও শান্ত হইলেন। উত্তেজনার বশে তিনি যে ব্যাপারটা সম্যকরূপ না জানিয়াই বনবীরের প্রতি কঠোর আচরণ করিতেছেন, ইহা কতক অনুভব করিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা কোমলস্বরে কহিলেন,—

"কোন দিকটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? বনবীর, সত্যই কি তুমি যথারীতি বিচারিত হইতে সাহস কর?"

বনবীর। সে সাহস না থাকিলে, আপনার শিবিরে আসিয়া ধরা দিব কেন?

মালদেব। তুমি যে এই উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছ, তাহা কি করিয়া বুঝিব?

বনবীর। মহারাজের ইহা বুঝিবারও প্রয়োজন নাই। এখানে আসিবার আমার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। তবে ইহাও বলি, কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে আমি যে আপনার বিষ নজরে পড়িব, তাহা আসিবার পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম।

মালদেব। ভাল, সবই যেন মানিলাম। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যটা কি?

বনবীর মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন ভাবিলেন। তৎপরে দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "সে প্রসঙ্গও, জানি, আপনার প্রিয়তর নহে। কিন্তু যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা পালন করিব।"

এই বলিয়া বনবীর মালদেবের নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি পিতা, গুরু, রাজা; আপনাকে বুঝাইতে যাওয়া আমার পক্ষে বাচালতা মাত্র। করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এই যুদ্ধ হইতে বিরত হউন!"

মালদেব কুটিল ভ্রূকুটি সহকারে বলিলেন, "সে কি বনবীর, তোমার মুখে এই কথা!"

বনবীর। মহারাজ, উভয়পক্ষের শুভজনক না হইলে, একথা কখনই এ রসনায় উচ্চারিত হইত না।

মালদেব। তবে বুঝি এতদিনে শুভের অর্থটা নিতান্ত বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। গৌরবের উচ্চ চূড়া হইতে নামিয়া যদি শত্রুর পদলেহন করাই শুভ হয়, তবে অশুভ কোনটাকে বলিব?

বনবীর। সত্যই কি এই যুদ্ধের পরিণাম আপনাকে সেই চূড়ার উপর সমাসীন রাখিবে? একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখুন, কয়েকটা স্বার্থলুব্ধ চাটুকার ছাড়া কয়জন লোক আপনার পক্ষে? যদি বিজয়ীই হন, তবুও চিতোরে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। মহম্মদ, আলাউদ্দিন নহে। আলাউদ্দিনের ন্যায় তাঁহার লোলুপতা থাকিতে পারে, কিন্তু লব্ধদ্রব্য সংরক্ষণের শক্তি কোথা? চিতোরোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানের সৌভাগ্য এখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

মালদেব বনবীরকে বাধা দিয়া সশঙ্ক অথচ রুক্ষস্বরে কহিলেন, —"মূঢ়, যদি প্রাণের আশা থাকে, কণ্ঠস্বর সংযত কর। ঐ দেখ অদূরেই সেই সৌভাগ্য এখনও প্রচণ্ড ভাস্করের ন্যায় দীপ্যমান।"

মালদেব বাক্যোচ্চারণের সহিত তদনুযায়ী ইঙ্গিত করিলেন।

বনবীর তদুত্তরে চিতোরের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া পিতার সাবধান অনুসারে অনুচ্চ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—

"ঐ দেখুন, করাল রাহুও ওখানে মুখব্যাদন করিতেছে।"

"বনবীর, নিশ্চয়ই তোমায় মতিভ্রংশ হইয়াছে। তোমার অপরাধ সম্পর্কে এতক্ষণ যে সন্দেহ ছিল, এক্ষণে সে সন্দেহ স্থির ধারণায় পরিণত হইল। তুমি শত্রুকে সিংহাসনে বসাইয়া এক্ষণে তাহার সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ দিতে আসিয়াছ? বিশ্বাসের কি অনুরূপ অনুষ্ঠান! স্নেহের কি উপযুক্ত প্রতিদান! ঐ কোমল কমনীয় আবরণের নীচে কে জানে যে এতটা কুটিলতা লুক্কায়িত ছিল। বনবীর, তুমি রাজপুত কুলের গ্লানি, তুমি নিজ বংশগৌরবের দীপ্তাকাশে ধূমকেতু, তুমি আততায়ী, তুমি পিতৃদ্রোহী।"

বনবীরকে এইরূপ কটুবাক্য বলিতে বলিতে ক্রোধে ও ক্ষোভে মালদেবের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সর্ব্বশরীর সন্তপ্ত রোগগ্রস্তের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার আসনের পার্শ্বে একটা বর্যা খাড়া ছিল, হতজ্ঞান মালদেব সহসা তাহা দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া বনবীরের দিকে উন্মত্তবৎ ফিরিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বনবীর পদমাত্রও নিজের স্থান হইতে সরিলেন না। কিন্তু মালদেবের হস্ত সহসা অন্যের বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ হইল। এই নবাগত ব্যক্তি মালদেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"যিনি সিংহাসনে বসিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে এতটা অসংযম কখনই শোভনীয় নহে।"

এই মৃদু ভর্ৎসনায় অধিকতর ক্রুদ্ধ না হইয়া মালদেব বরং অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। রোষাবেশে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তিনি যে বিষম কাণ্ড করিতে যাইতেছিলেন, তাহার ভীষণতা বুঝি কতক হৃদয়ঙ্গম করিলেন। মালদেব মনে মনে আগন্তুককে শতবার ধন্যবাদ দিলেন বটে, তথাপি রুক্ষস্বরে কহিলেন,—

"কে তুমি সন্ন্যাসী, মালদেবের কার্য্যে বাধা দিতে উদ্যত?"

সন্ন্যাসী কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মালদেবের কার্য্য মনুষ্যোচিত হইলে, সন্ন্যাসী তাহাতে অন্তরায় হইত না। কিন্তু এরূপ কার্য্য মানুষে সম্ভবে না, ইহা পিশাচেরই অনুষ্ঠেয়।"

মালদেব যেন কিছু লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "যাহা দেখিয়াছ, তাহা হত্যার উদ্যম না হইয়া ভীতি-প্রদর্শনও হইতে পারে।"

সন্ন্যাসী। তাহাতেই বা প্রয়োজন কি?

মালদেব। অপরাধীর অপরাধ স্বীকার করাইতে হইলে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

সন্ন্যাসী এবার দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, সে বিষয়েও নিরস্ত থাকুন। বনবীর যে অপরাধী নহেন, এই সাক্ষ্য দিতেই আমি এখানে উপস্থিত।"

মালদেবের বদনমণ্ডল এবার প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। বাস্তবিক বনবীরের প্রতি মালদেব সমধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। বনবীর এমন বিষম কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত হন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। সন্ন্যাসীর আচরণে ও কথায় মালদেব বুঝিলেন, বনবীরের সপক্ষে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তিনি রুক্ষমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন,—

"কে আপনি যে আপনার কথায় বিশ্বাস করিব?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "আমি আপনার কন্যা মহারাণী শিবানীর দূত।"

মালদেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "উত্তম। আপনার দৌত্য সম্পন্ন করুন।"

সন্ন্যাসী। আমার দৌত্যের প্রথমাংশ, বনবীরের উপর যে অন্যায় সন্দেহ সঞ্জাত হইয়াছে, তাহার অপসারণ। যে কার্য্যের জন্য বনবীরকে দোষী করা হইয়াছে, সে কার্য্যের জন্য দায়ী স্বয়ং মহারাণী শিবানী। বনবীরের সহিত সে কার্য্যের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই।

মালদেব সন্দিগ্ধচিত্তে বাধা দিয়া বলিলেন, "তবে কি হরিসিংহ মিথ্যাবাদী?"

সন্ন্যাসী। না হরিসিংহেরও অপরাধ নাই, তিনি ভ্রান্তি-জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন।

মালদেব। কিছুই বোধগম্য হইল না। রহস্য খুলিয়া বলুন।

সন্ন্যাসী ধীরস্বরে উত্তর দিলেন, "শিবানীই বনবীরের বেশে কারামধ্যে প্রবেশ করিয়া মহারাণা হামিরের উদ্ধারার্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। শিবানীর অন্যতরা সহচরীই বনবীরের সাজে ভ্রান্ত প্রহরীদিগের দ্বারা দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত করাইয়াছিলেন।"

হামির কারারুদ্ধ হইলে শিবানী কেবল কৈলবারায় সংবাদ প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নিজেও বিপদুদ্ধারের নানা উপায় দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে বিশ্বস্ত অনুচরদিগের দ্বারা অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। ওদিকে জলধরও অনেক দিন ধরিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শিবানী তখন স্বামীর উদ্ধারার্থ স্বয়ং কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অবলম্বিত কৌশলটিও বেশ খাটিয়া গেল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিবানীর অগ্রজ বনবীরের গঠন কিছু নারীভাবাপন্ন। শিবানী বনবীরের পরিচ্ছদের অনুরূপ একটা সাজ প্রস্তুত করাইলেন। সেই সাজ শাস্তার গৃহে রাখিয়া দিলেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে শিবানী সেই ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া উপযুক্ত যানযোগে বাহির হইলেন। হামিরের কারাক্লেশ নিবারণার্থ উপহারস্বরূপ যেন উপাধান প্রভৃতি কয়েকটা শয্যার উপকরণ একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া চলিল। কারাগারে উপস্থিত

হইলে বনবীর বোধে প্রহরীরা শিবানীকে দ্বার খুলিয়া দিল। তিনি সেই উপাধানাদি হামিরকে দিয়া, সমস্ত বুঝাইয়া শান্তার গৃহেই ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদে চলিয়া গেলেন। চপলা রাজপথে যাইতে যাইতে প্রহরীদ্বয়ের যে কথোপকথন শুনিয়াছিল, তাহা এই নকল বনবীর সম্বন্ধেই; লজ্জায় হউক, আর যাহাতেই হউক, আসল বনবীর কখন কারারুদ্ধ হামিরের সহিত দেখা করেন নাই। শিবানীর পরিত্যক্ত সেই নকল পরিচ্ছদ কিরূপে শান্তার নিকট হইতে চপলার হাতে গেল এবং চপলাই বা তাহা লইয়া কি করিয়াছিল, ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে, তাহার আর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

শিবানীর বন্দীশালায় গমনের পরদিন যখন প্রদোষের ছায়া ক্রমে কারাকক্ষে প্রবেশ করিল, তখন হামির শিবানীর প্রদত্ত উপাধান ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে লুক্কায়িত তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া শয্যাতলে রাখিলেন। তাঁহার ভোজনক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ পরেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। প্রহরীরা বাহিরে সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ খাড়া রহিল, খাদ্য-বাহক কক্ষে প্রবেশ করিল। হামির ধাক্কা দিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং নিমেষমধ্যে শৃঙ্খলমুক্ত সিংহের মত প্রহরীদের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য তাহারা কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না, তবুও তাহারা প্রাণপণে যুঝিল। কিন্তু সশস্ত্র হামিরকে বাধা দেয় কাহার সাধ্য। তাহারা সংখ্যায় অনেক জমিলেও, হামির মুহূর্ত্ত-মধ্যেই তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখনও

নগরের সকল দ্বার রুদ্ধ হয় নাই। তাঁহার পক্ষে দুর্গের বাহিরে যাওয়া কিছুই আয়াসসাধ্য হইল না। বাহিরে নিজ শিবিরে গিয়া শুনিলেন, জলধর সৈন্য লইয়া অন্য দিক দিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টায় আছেন। হাম্মির অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ তদ্দিকে ধাবিত হইলেন। হরিসিংহের কর্ণে হাম্মিরের সংক্রান্ত এই সংবাদ পৌঁছিবার অগ্রেই যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য হরিসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে হাম্মিরকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অধুনা দূতস্থানীয় পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী সবিস্তারে উল্লিখিত সমস্ত ঘটনা মালদেবের নিকট বিবৃত করিলেন। বনবীর সম্পর্কে মালদেবের সমস্ত সন্দেহের ঘোর কাটিয়া গেল। সন্ন্যাসীর বাক্যাবসানে মালদেব কিয়ৎক্ষণ নীরব ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে গম্ভীর অথচ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন,—

"শিবানী অগ্রজের দোষক্ষালনের প্রমাণ পাঠাইয়া অবশ্য সহোদরার উচিত কার্য্যই করিয়াছে। কিন্তু নিজের পিতৃ-দ্রোহিতা সম্বন্ধে কি কিছু তাহার বক্তব্য আছে?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "শিবানী শুধু মালদেবের কন্যা নহেন, শিবানী হাম্মিরের মহিষী। বিপন্ন স্বামীকে সহায়তা করা পতিব্রতার মুখ্য কর্ত্তব্য।"

মালদেব। ভাল, স্বামীকে উদ্ধার করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই হইত, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে স্ত্রীলোকের এতটা জড়িত না হইলে কি চলিত না?

চিতোরের উদ্ধারব্রতে শিবানীও যে বিশেষরূপ ব্রতী মালদেব পূর্ব্ব হইতেই তাহা কতক জানিতেন। এক্ষণে সে ধারণা অবশ্য আরো দৃঢ়মূল হইয়াছে। সন্ন্যাসী তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্ববৎ কহিলেন,—

"শিবানী শুধু হামিরের মহিষী নহেন। শিবানী রাজপুত-মহিলা। রাজপুতের নষ্ট গৌরব উদ্ধারার্থ কোন বীরাঙ্গনা না আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে উন্মুখ? বড়ই দুঃখের বিষয়, রাজপুতের মুখ হইতে আজ ইহার বিপরীত কথা শুনিতে হইল।"

সন্ন্যাসী আর কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু মালদেব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সন্ন্যাসী, আপনার দৌত্য শেষ হইয়াছে। আপনি বিদায় লইতে পারেন।"

সন্ন্যাসী। একাংশ মাত্র শেষ করিয়াছি, অপরাংশ এখনও অবশিষ্ট আছে।

মালদেব। তাহারও উত্থাপনে বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

সন্ন্যাসী। শিবানী পিতৃসমীপে এই উপস্থিত আত্মকলহ হইতে নিবৃত্তি প্রার্থনা করিয়াছেন।

মালদেব বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, "আমার আবার এমন আত্মীয় কে?"

সন্ন্যাসী। আপনি রাজপুত। রাজপুতই আপনার আত্মীয়। আপনি একবার সে আত্মীয়তা লঙ্ঘন করিয়া অন্তর উপায়ে

বড় হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সমগ্র রাজপুত-জাতির সমীপে আপনি কি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন?

মালদেব। তবে কি আপনার মতে এক্ষণে অপহরণকারীকে শাস্তি না দিয়া তাহার করমর্দ্দন করিলেই, খুব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যাইবে?

সন্ন্যাসী এবার উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "মালদেব, মিথ্যাকে সত্যের সাজ পরাণ বিড়ম্বনা মাত্র। কাহার এ চিতোর? তোমার?"

মালদেব। এ চিতোর আলাউদ্দিনের। আলাউদ্দিন তাহা আমার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী। এ চিতোর রাজপুতের, পাঠান তাহা অপহরণ করিয়াছিল। তুমি সেই অপহৃত ধন হাতে লইয়া সমগ্র রাজপুতজাতির ঘৃণার্হ হইয়াছ। যদি এখন সুমতি হয়, আত্মীয়ের সহিত সৌহার্দ্দ্য কর। হামির চিতোরের রাণা বংশধর, রাজস্থানের গৌরব, তোমারও নিকট আত্মীয়, জামাতা। যোগ্য পাত্রেই চিতোরের অধিকার বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষোভ কি, দুঃখ কি, আক্রোশই বা কেন?

মালদেব এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, "দূত ও সন্ন্যাসী বলিয়া অনেক সহ্য করিয়াছি। কিন্তু সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। বাচালতা রাখিয়া যথাস্থানে প্রস্থান কর। পুরাতন ইতিহাস আবৃত্তির এস্থান নয়।"

"ঠিক বটে। এটা যে নূতন প্রভুর নূতন ক্রীতদাসের স্থান।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গম্ভীর পদবিক্ষেপে শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বনবীর এতক্ষণ নীরবে নতশিরে সন্নিকটে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে, মালদেব তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমিও কি এই ভণ্ড সন্ন্যাসীর অনুবর্ত্তন করিবে?"

বনবীর মাথা তুলিয়া বলিলেন, "যাহাদের গন্তব্য পৃথক, তাহাদের পথও পৃথক।"

মালদেব। কেন তুমিও তো নূতন আত্মীয়ের নব প্রীতিরস আস্বাদনে বড়ই পিয়াসী।

বনবীর বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "প্রীতি না চাই, সঙ্কল্প করিয়াছি, বিরোধে আর জড়িত থাকিব না।"

মালদেব। তবে করিবে কি?

বনবীর। আপনি পিতা, সন্তানকে শিক্ষা দিন।

মালদেব। বনবীর, আমার শিক্ষা যে ভিন্নতর। সে শিক্ষায় আছে প্রবল প্রতিশোধ, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, অপ্রতিহত সাধনা।

বনবীর নতশিরে বলিলেন, "ভিন্নতর উদ্দেশ্যে উহা প্রযুক্ত হইলে উত্তমই হইত। এক্ষণে বলুন, বর্ত্তমান যুদ্ধকার্য্যে যদি যুক্ত না হইতে পারি, তবে কি দূরে থাকিবার অনুমতি পাইব?"

মালদেব বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "অনুমতির আবশ্যকতা নাই। যেখানে ইচ্ছা সেইখানে তুমি থাকিতে পার। বৃথা বাক্যব্যয়ে অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি।"

এই বলিয়া মালদেব উঠিয়া শিবিরের বহির্ভাগে যাইবার উপক্রম করিলেন। বনবীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি না করিয়া পিতার চরণতলে প্রণত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। দূরে বনবীরের বিষাদানত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া মালদেবের বুঝি একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর দুই এক দিনের মধ্যেই পুনরায় যুদ্ধাভিযান আরব্ধ হইল। পথক্লম বিনোদনার্থ কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া মহম্মদের সেনাদল এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহে নিজ নিজ কার্য্যে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছোট বড় তাম্বু ও বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার বিচিত্র আকারের ও বিচিত্র বর্ণের পুলিন্দায় পরিণত হইয়া যথাক্রমে শ্রেণীবদ্ধ যানসমূহের স্কন্ধে আসন গ্রহণ করিল। অশ্বের ক্ষুরধ্বনিতে, অস্ত্রের ঝনঝনায়, যানাদির রোলে ও সকলের গণ্ডগোলে বহুদূর ব্যাপিয়া বনভূমি শব্দিত হইয়া উঠিল। নিশান উড়িল, বিষাণ বাজিল। কাতারে কাতারে সৈন্যবৃন্দ, চাকর, নফর, বাদক, বাহক কেহ পদব্রজে, কেহ বাহনে, কেহ যানে, অরণ্যপথ কম্পিত করিয়া চলিতে লাগিল।

প্রভাতের অরুণ রাগ প্রথমে অসংখ্য বর্ষাফলকে, সমুজ্জ্বল পতাকাগ্রে ও বিবিধ দণ্ডের চূড়ায় পড়িয়া ঝকমক করিয়া উঠিল। ক্রমে পত্রের অন্তরাল দিয়া যখন নীচে নামিল, তখন শত শত উজ্জ্বল বর্ম্ম, চর্ম্ম, উষ্ণীষ ও অশ্বসজ্জায় প্রতিফলিত হইয়া বনের অভ্যন্তরভাগ অধিকতর আলোকিত করিয়া তুলিল। সেই চিরনিভৃত অরণ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে একটা মহা গোলযোগ সংঘটিত হইল। সুপ্তোত্থিত পক্ষিকুলের মধ্যে এই নবাগত অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিবার প্রয়াসমাত্রও লক্ষিত হইল না। কোনটা নীরবে আড়ালে লুকাইল, কোনটা দূরে সরিয়া গেল, কোনটা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, যেটা খুব সাহসী সে এই অনধিকার প্রবেশকারীদিগের মাথার উপর দুই একবার ঘুরিয়া

ফিরিয়া দুই একটা কড়া কথাও শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। হরিণেরা অর্দ্ধকবলিত শষ্প মুখে করিয়াই ছুটিল। ব্যাঘ্র, বরাহ, ভল্লুক প্রভৃতি বনচর বীরগণও মহা সন্ত্রস্ত হইয়া দ্রুতগমনে পলায়নপর হইল। এইরূপে বনভূমি তোলপাড় করিয়া মহম্মদের বিপুলবাহিনী চিতোরাভিমুখে চলিতে লাগিল।

মহম্মদ বিলাসী সৌখীন পুরুষ। যুদ্ধবিষয়ে অভিজ্ঞতা তাঁহার খুব কমই ছিল। কিন্তু দম্ভ অভিজ্ঞতার শূন্যতাটুকু পূরাইয়া রাখিতে ভুলে নাই। কাজেই তিনি নিজেকে একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ও মহা বীরপুরুষ বলিয়াই মনে করিতেন। একদিন যখন তাঁহার সৈন্যদল পথের একটা সন্ধিস্থলে আসিয়া পৌঁছিল, তখন একটা মন্ত্রণার বৈঠক বসিল। কোন্ পন্থা এখন অনুসরণীয় ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিল। দুই পথের একটিতে যাইলে শীঘ্র চিতোরে পৌঁছান যায়, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্গম। সৈন্য-চালনায় অনভিজ্ঞ অথচ হঠকারী মহম্মদ অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া এই পথই মনোনীত করিলেন। শত্রুকে যত শীঘ্র পারা যায় বিতাড়িত করিবার জন্য মালদেব বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রভুর মতেই মত দিলেন। সৈন্যবৃন্দ সেই দুর্গম পথ ধরিয়াই চলিল।

চারিদিকে পর্ব্বতমালা—কোনটা ক্ষুদ্র, কোনটা বৃহত্তর। মহম্মদের বাহিনী তাহারই মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল। পদে পদে নানা বাধা পড়িতে লাগিল। কোনস্থানে এমন চড়াই যে উহা অতিক্রম করা অতি ক্লেশসাধ্য। কোন স্থানে এমন উৎরাই যে অবতরণ করিতে করিতে অনেকে পড়িয়া গিয়া আহত হইল, কয়েকজন পঞ্চত্বও পাইল। স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য

সরিৎ গভীর আবর্ত্তে গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে—কোনটা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া অতিক্রম করিতে হইল, কোনটিকে ঘুরিয়া বেড়িয়া যাইতে হইল। এইরূপ বিঘ্নসঙ্কুল প্রদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে সৈন্য-দল শেষে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। যে স্থান হইতে যে দিকে যাওয়া উচিত তাহার বিপরীত দিকে চলিল, আবার কিছু পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেইস্থানে আসিয়াই পৌঁছিল। সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে, গভীর অরণ্যে, বন্ধুর উপত্যকায় এই অসংখ্য জনসঙ্ঘ যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায় পাক খাইতে লাগিল। যে সময়ের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার কথা তাহা অতীত হইয়া আর কতদিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু পথের যে কিছুই ঠিকানা নাই।

আহার্য্যের পরিমাণ ক্রমে কম পড়িয়া আসিল। সৈন্যবৃন্দ একে নিরতিশয় ক্লান্ত, তাহার উপর পূরা আহার জোটা ভার। বাসস্থানও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। অরণ্যমধ্যে সিক্ত ভূমিশয্যায়ই অনেকদিন কাটাইতে হয়। সুতরাং নানা সাংঘাতিক ব্যাধি দেখা দিল।

উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে এই ব্যাধি ক্রমে মহামারীর আকার ধরিল। দলে দলে সৈন্যগণ মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে লাগিল। বিপদের অন্ত নাই, দুর্দ্দশার সীমা নাই। ক্ষুধাতুর খাদ্য পায় না, তৃষ্ণাতুরের জল মিলে না। চারিদিকে শত শত জন রোগশয্যায় শয়ান। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার শুশ্রূষা করে, কে কাহার তত্ত্ব লয়। সৎকারের অভাবে মৃতদিগের শব পচিয়া সেনাবাসকে দ্বিতীয় নরক করিয়া তুলিল। উচ্চপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দূরে দূরে অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া কতকটা রোগমুক্ত রহিলেন। কিন্তু সাধারণ সৈন্যদিগের অবস্থা যার পর নাই

শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ ভাবে আরো, কিয়দ্দিন কাটাইতে হইলে, সম্ভবতঃ সকলকেই ধরিত্রীর কাছে বিদায় লইতে হইত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটা কিনারা মিলিল। অনেক অন্বেষণের পর সেই ভীষণ স্থান হইতে নির্গমনের একটা পথ বাহির হইল। মহম্মদ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, অনেক সৈন্য হারাইয়া, অনেক ভোগ ভুগিয়া শেষে যে স্থানে গিয়া উঠিলেন, তাহার নাম শিঙ্গোলি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদের ইচ্ছা ছিল, একেবারে চিতোরে গিয়া সংকীর্ণ পুরীর মধ্যেই ক্ষুদ্র রিপুদলকে পিপীলিকার মত পিষিয়া ফেলিবেন, কিন্তু ঘটনাচক্র তাঁহাকে এই শিঙ্গোলিতেই সৈন্য সন্নিবেশিত করিতে বাধ্য করিল। হামিরের সৈন্যবল সংখ্যায় তাঁহার বিপুল বাহিনীর তুলনায় অবশ্যই অল্প বটে, কিন্তু মহম্মদের দম্ভ তাহাকে আর ক্ষুদ্রতর অতি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ বলিয়াই অনুমান করিয়াছিল। মহম্মদের ধারণা যাহাই হউক, দিল্লীশ্বরের ভয়ে হামির চিতোরে লুকাইয়া রহিলেন না। চিতোরাধিকারের পর হামিরের সৈন্যসংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি শত্রুকে চিতোর পর্য্যন্ত আসিবার সুযোগ দিলেন না। মহম্মদের অভিযানবার্ত্তা শ্রবণে হামির নগর রক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া অবিলম্বে তথা হইতে সসৈন্যে

যাত্রা করিলেন। সুতরাং মহম্মদের পূর্ব্বের আশা আর ফলবতী হইল না। শিঙ্গোলিতেই তাঁহাকে শত্রুসৈন্যের সম্মুখে পড়িতে হইল।

এই প্রদেশ প্রায়শঃ পর্ব্বতসমাকীর্ণ বলিয়া বড়ই বন্ধুর। ইহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটি সমতল প্রান্তরে উভয় পক্ষের সৈন্য সজ্জিত হইল। মহম্মদের সৈন্য দুর্গম অরণ্যমধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও, এখনও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও হামিরের সৈন্যাপেক্ষা সংখ্যায় ন্যূন নহে। মহম্মদ শিঙ্গোলিতে কয়েকদিন বিশ্রামেরও অবসর পাইয়াছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সেই দুর্দ্দশাপন্ন ও অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট সৈন্যদলও সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। সুতরাং পূর্ব্বে যাহাই হউক, যুদ্ধারম্ভে মহম্মদের সুযোগ ও সুবিধার কিছু অল্পতা লক্ষিত হইল না। কিন্তু একটা বিষয়ে পাঠানপক্ষের কিছু অভাব রহিল। এমন প্রবল বাহিনী অথচ ইহার যোগ্য সেনাপতি কেহ নাই। মহম্মদ নিজে যুদ্ধ বিষয়ে নিতান্ত অপটু, নিজের এই অপটুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানটা একটু প্রখর থাকাই উচিত ছিল। তাহা হইলে হয়তো অপেক্ষাকৃত দক্ষতর হস্তে সৈনাপত্যের ভার ন্যস্ত হইতে পারিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহম্মদ লোকটি ভারি দাম্ভিক। কোন বিষয়ে নিজের অসামর্থ্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। এরূপ প্রকৃতির লোক কোন বিষয়ে অপরের শ্রেষ্ঠত্বও বড় দেখিতে পায় না। কাজেই সৈনাপত্যটা বড় কাঁচা হাতেই পড়িল। মহম্মদ স্বয়ং সেনাদলের চালনারশ্মি গ্রহণ করিলেন। মালদেবের কিছু সমরজ্ঞান ছিল বটে, তবে কিনা অধিকসংখ্যক ও বিচিত্রপ্রকৃতির

সেনাদল তিনি কথন রণক্ষেত্রে চালিত করেন নাই। যাহাই হউক, তাঁহার উপর সৈনাপত্য থাকিলে, মন্দের ভাল হইত।

অপর পক্ষ সংখ্যায় অবশ্য অল্প, কিন্তু তাহার সমাবেশের ভার সুযোগ্য পাত্রেই সন্ন্যস্ত। হামির একজন বিক্রমশালী ও বিচক্ষণ সেনাপতি। কৈশোর হইতেই তাঁহার জীবন এই কার্য্যেই ব্যাপৃত। শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করিবার নানা কৌশল ও পন্থা তিনি পরের মুখে শুনিয়া নহে, নিজের ভূয়োদর্শন দ্বারা সম্যক অবগত ছিলেন। তদুপরি তাঁহার ছিল দুর্দ্দম্য ভুজবল ও অমানুষিক তেজস্বিতা। দাম্ভিক মহম্মদের ন্যায় তিনি যোগ্য লোকের পরামর্শও অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহার তেজস্বিতা মহম্মদের হঠকারিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের কাল্পনিক খেয়ালে মহম্মদ নিজেকেই বড় মনে করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হামির যথার্থ বড় হইয়াও অপরের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি নিজের সামন্তগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করিলেন। বিশেষতঃ জলধর ও সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তিনি এ বিষয়ে সমধিক সাহায্য পাইলেন। সমরনীতিতে জলধর বড়ই বিচক্ষণ। তাঁহার সাহস ও শক্তিও বড় কম ছিল না। এরূপ সহকারী সকলের ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। হামির জলধরের অনেক প্রস্তাব বিশেষ আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে প্রান্তর যুদ্ধাঙ্গনে পরিণত হইল, তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশের ন্যায় তাহা নিতান্ত বন্ধুর না হইলেও, তাহা সম্যকরূপে সমতল নহে। তাহার যে দুই দিকে দুই পক্ষের সৈন্যব্যূহ সমাবেশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যস্থ ভূমিভাগ অপেক্ষাকৃত নিম্নতর। বর্ষাকালে পার্ব্বত্য সরিৎ অনেক সময় এই নিম্ন পথ ধরিয়া ক্ষিপ্রবেগে চলিয়া যায়। কিন্তু এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক ও কোমল শষ্পে আচ্ছাদিত।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের সংহারমূর্ত্তি দেখা দিল। বিপরীত দিক হইতে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আকাশ পূর্ণ করিয়া উভয়পক্ষের সমরবাদ্য গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মহম্মদ সমগ্র সৈন্যদল লইয়া দ্রুতগতিতে যুদ্ধাঙ্গনে নামিলেন। হামির নিজের দলকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। একভাগ লইয়া নিজে মহম্মদের সৈন্যের সম্মুখে সেই নিম্নতর স্থানে আসিয়া অটল ভাবে দাঁড়াইলেন। অপর ভাগের সহিত জলধর কিছু দূরে আপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে অবস্থিত রহিলেন। কিন্তু এই দুই অংশের মধ্যে তেমন ব্যবধান না থাকায়, শত্রুগণ এই বিভাগের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিল না। ক্রমে বর্ষার সহিত বর্ষার, অসির সহিত অসির সংঘর্ষে চারিদিক হইতে বিষম ঝনঝনা উত্থিত হইল। উভয় পক্ষই প্রবল প্রতাপে পরস্পরকে আক্রমণ করিল। রাজপুতের হৃদয়ে বহুদিন হইতে যে প্রতিশোধ-বাসনা প্রধূমিত হইতেছিল,

আজ তাহা কালাগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। পাঠানও নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণপণ করিতে ছাড়িল না।

এইরূপে অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল। মহম্মদ সমগ্র সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধাঙ্গনে নামিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই সংঘর্ষে যোগ দিতে পারিতেছিল না। যাহারা অগ্রগামী তাহারই মাত্র যুদ্ধ করিতেছিল, পশ্চাদ্বর্ত্তীরা একরূপ নিষ্কর্ম্মার ন্যায়ই খাড়া ছিল। তাহাদিগকে কাজে লাগাইবার কৌশল মহম্মদের মাথায় আসে নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এমন তীব্রবেগে তাঁহার বিপুল সৈন্যসমষ্টি চালাইলেন যে, একই নিশ্বাসে শত্রুদিগকে তুলারাশির মত উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ফলে তাহা হইল না। সেই কল্পিত তুলারাশি যেন পাষাণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিল।

ওদিকে হামিরের বিভক্ত বাহিনীর অন্যতর অংশও এতক্ষণ কিছু দূরে উচ্চতর ভূমিভাগে নিস্তব্ধভাবেই দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এইবার তাহারা তাহাদের কার্য্য আরম্ভ করিল। তাহাদের প্রত্যেকের পায়ের কাছে তৃণগুচ্ছের ভিতরে ধনুক ও তীরপূর্ণ তূণীর পতিত ছিল। শত্রুপক্ষ তাহাদের উদ্দেশ্য প্রথমেই পাছে বুঝিতে পারে, সেই জন্য এরূপ গোপনে ঐ সব অস্ত্র তাহারা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে সম্মুখস্থ যুদ্ধরত মুসলমান সেনা কিছুতেই হঠিতেছে না দেখিয়া সেনাধ্যক্ষ জলধরের ইঙ্গিতে তাহারা সেই ধনু ও তূণীরে সজ্জিত হইল। মহম্মদের যে সকল সেনা কিছু উচ্চতর স্থানে পশ্চাদ্দেশে নিষ্কর্ম্মা দাঁড়াইয়া ছিল, বিপরীত দিকের উচ্চতর স্থান হইতে জলধরের সেনাদল তাহাদের

উপর শরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। অতর্কিতভাবে এইরূপ আক্রান্ত হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যদল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। প্রথমে তাহারা তাহাদের হস্তস্থিত ঢালের দ্বারা এই সকল নিক্ষিপ্তাস্ত্রের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দেখিল, এই সকল তীরের গতি অতি বিচিত্র—অপূর্ব্ব কৌশলে তাহা নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোনটা সম্মুখে বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, কোনটা আকাশ হইতে নিম্নাভিমুখে মস্তক লক্ষ্য করিয়া পড়িতেছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সুশিক্ষিতের পক্ষে চর্ম্মাদি দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীর এরূপ শরক্ষেপের সম্যক প্রতিরোধ সম্ভবপর, কিন্তু দলযুদ্ধে অজস্র শরবৃষ্টির মুখে আক্রান্তেরা বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল। এই অপ্রত্যাশিত বিপদের কোন যোগ্য প্রতিকারই তাহারা খুজিয়া পাইল না। তাহারা কিছুক্ষণ নিজস্থানে স্থির থাকিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তীরবর্ষণেরও বিরাম নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অজস্রধারে পড়িতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় আর কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারা যায়, আক্রান্তেরা শেষে শরাহত শোণিতাক্তদেহে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

মহম্মদ সম্মুখবর্ত্তী সৈন্যব্যূহের পৃষ্ঠের নিকটেই দাড়াইয়া ছিলেন, আর বেশী অগ্রসর হইতে বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই। শরবর্ষণ-পীড়িত সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ হইতে দেখিয়া তিনি এবার বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। জলধর এবার নিজের দলকে আবার দুইভাগ করিলেন। একজন যোগ্য সামন্তের অধীনে ইহার একাংশ যেরূপ ভাবে সজ্জিত ছিল সেইরূপ রাখিয়া, নিজে অপরাংশ লইয়া হামিরের সহিত যোগ দিলেন। রাজপুতসেনা এবার দ্বিগুণতর-তেজে শত্রুদিগকে

আক্রমণ করিল। হাম্বিরও সম্ভবতঃ এই সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবার তিনি যেরূপ অসুরবিক্রমে শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপতিত হইলেন, তাহা রোধ করা যেন মানবশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়াই মনে হইল। সেই দুর্জ্জয় প্রতাপের সম্মুখে অপরপক্ষের তিষ্ঠান যেন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। মহম্মদ মালদেবের হস্তে এবার সৈনাপত্যের ভার দিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পলায়নের পন্থা যে বড় নাই। এখনও কিয়দ্দূরে শত্রুসৈন্য শরাসনহস্তে দণ্ডায়মান। মহম্মদ যেখানে ছিলেন, সেখানে তত তীর আসিয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র পশ্চাতে সরিতে গেলেই যে মুক্তস্থানে অসংখ্য তীরের একমাত্র লক্ষ্য হইতে হইবে। এদিকে হাম্মিরের সৈন্য পাঠানব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার অতি নিকটে আসিয়া পড়িল। মহম্মদের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণমধ্যেই বিজয়োন্মত্ত রাজপুতসেনা তাঁহাকে চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলিল। অচিরেই শত্রুহস্তে মহম্মদ বন্দী হইলেন। মহম্মদের এই দুর্দ্দশা-দর্শনে সমগ্র পাঠানসৈন্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শনে উদ্যত হইল। মালদেব ও হরিসিংহ বহুকষ্টে তাহাদিগকে ফিরাইলেন। আবার একবার উভয় পক্ষে ভীষণ সংঘর্ষ বাধিল। মালদেব ও হরিসিংহ হতাশায় উন্মত্তবৎ যুদ্ধে লাগিলেন। হাম্মির ও জলধর তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য ভীমবিক্রমে অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

বিশেষতঃ এবার একদিকে হরিসিংহ ও অপরদিকে জলধর যেন প্রাণের মমতা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াই আহবে মাতিলেন। জলধরের আত্মসংরক্ষণের প্রয়াস কিছুমাত্র নাই।

কেবল শত্রুনিপাতেই তিনি যেন বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন। এত দিন ধরিয়া যে ব্রত পালন করিয়াছেন, আজ যেন নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তাহা উদ্যাপন করিবেন। তাঁহার জীবনে সুখের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে, তবে বৃথা সে জীবনের ভার বহন করা কেন? আজ তাহা মিবারের মঙ্গলার্থে শেষ করিতেই যেন জলধর কৃতসঙ্কল্প। জলধর যেরূপ অসতর্কভাবে নিজেকে শত্রুর লক্ষ্যস্থলে স্থাপিত করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যু-সঙ্কল্প সেই দিনেই সিদ্ধ হইত। কিন্তু একজন গৈরিকবেশী পুরুষ সেই সময়ে তাঁহাকে নিয়ত নানা উপায়ে রক্ষা করিতে লাগিলেন। জলধর যে দিকে যান, সেই গৈরিকধারী কয়েকজন অনুচরের সহিত ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অনেকবার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। এই গৈরিকধারী সেই গুরু-স্থানীয় সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ঠিক যোদ্ধৃবেশে যুদ্ধস্থলে আসেন নাই। তিনি শত্রুপক্ষের কাহাকেও আঘাত করিতেছিলেন না। কিন্তু শত্রুপক্ষের আঘাত প্রতিরোধার্থ যে দুই একটা প্রহরণ তাঁহার ছিল, তাহাদের যথাযোগ্য ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাশীল সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে হয় নাই।

হরিসিংহও ওদিকে প্রাণপণে যুদ্ধের গতি ফিরাইবার চেষ্টা পাইলেন। এই যুদ্ধে পরাভূত হইলে তাঁহাদের যে আর মাথা রাখিবার স্থান থাকিবে না, এই চিন্তায় হরিসিংহ ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে যেন উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে হামিরকে দেখিয়া হরিসিংহ বন্য বরাহের মত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। হামির স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিসিংহ অসিহস্তে একেবারে তাঁহার

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হামির সে আক্রমণের বেগ সহজেই নিরাকৃত করিয়া হরিসিংহকে নিরস্ত হইতে কহিলেন।

হরিসিংহ হতাশায় জ্ঞান হারাইয়াছিলেন, হামিরকে তদুত্তরে অকথ্য ভাষায় তিরস্কৃত করিয়া আবার তরবারি উত্তোলন করিলেন। হামির আরো কয়েকবার তাঁহাকে আঘাত না করিয়া কেবল আত্মরক্ষা করিলেন। কিন্তু হরিসিংহের ঔদ্ধত্য বাড়িতে লাগিল। অজস্র গালি বর্ষণপূর্ব্বক বারম্বার আক্রমণে তিনি হামিরকে ক্রমে অত্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। শেষে হামিরের প্রথম আঘাতেই হরিসিংহের প্রাণহীন দেহ ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। মালদেবও যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। হরি-সিংহের পতনে তাঁহার সকল আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল। ভগ্নহৃদয় শোকগ্রস্ত মালদেব শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পাগলের ন্যায় যথেচ্ছভাবে অসি ঘুরাইতে লাগিলেন। হামির সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না। থাকিলে হয়তো কৌশলক্রমেই তাঁহাকে বন্দী করিতে প্রয়াস পাইতেন। আক্রান্ত রাজপুত সৈনিকরাও তাঁহাকে চিনিত না। শীঘ্র একটা শূল প্রবলবেগে আসিয়া মালদেবের বক্ষে বিঁধিয়া গেল। তাহার চেতনাহীন দেহ ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একজন অশ্বারোহী ত্বরিতবেগে সেস্থানে আসিয়া উপনীত হইল এবং পতনোন্মুখ মালদেবের দেহ অশ্বোপরি স্থাপিত করিয়া ক্ষণমধ্যেই যুদ্ধাঙ্গন হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহম্মদের বহু সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নষ্ট হইয়াছিল, ইহার পর অবশিষ্ট কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানাই রহিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের পরদিন অপরাহ্নে হামির একাকী পরিক্রমণে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্যদল এখনও শিঙ্গোলি ত্যাগ করে নাই। শত্রুপক্ষ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, মহম্মদ স্বয়ং তাঁহাদের করতলগত, সে দিক হইতে আর কোন আশঙ্কার কারণ মাত্রও নাই। বিশ্রামার্থ দুই এক দিন শিঙ্গোলিতে নিশ্চিন্তভাবেই থাকিতে পারা যায়, তাই রাজপুত-সৈন্য এখনও চিতোরে ফিরে নাই, তবে যাত্রার সমস্ত আয়োজন ও উদ্যোগ চলিতেছে।

হামির মন্থরগতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যুদ্ধাঙ্গনের পার্শ্ব দিয়াই যাইতেছিলেন। দূর হইতে বৃক্ষশ্রেণীর অবকাশমধ্য দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য মাঝে মাঝে তাহার দৃষ্টিপথে পড়িতেছিল। তাই মাঝে মাঝে তিনি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইতেছিলেন। বিজয়ীর গৌরব ও হর্ষের সহিত বিষাদের রেখাও বুঝি তাহার মর্ম্মস্থলে অঙ্কপাত করিতেছিল। যুদ্ধের আরম্ভের সহিত যুদ্ধের পরিণতির কি নিদারুণ বিপর্য্যয়!

আজ কোথা সে উদ্যম, কোথা সে উৎসাহ, যাহা কাল ঐ প্রাঙ্গণশায়িত শত শত বক্ষপঞ্জর আন্দোলিত করিয়াছিল! সে হুঙ্কার, সে আস্ফালন, সে উন্মাদনা কোথায়! যে চক্ষু দিয়া কাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়াছিল, আজ তাহা হিমানী-শীতল। যে ভুজে কাল অসুরের তেজ ছিল, আজ তাহাতে ক্ষুদ্র পিপীলিকাটাও সরাইবার শক্তি নাই। যে পদভরে কাল

মেদিনী কাঁপিতেছিল আজ তাহা যেন ঐ মেদিনীরই অঙ্গীভূত—তাহারই মত অচল, অসাড়, নির্জীব। সেই ক্রোধ, সেই বিদ্বেষ, সেই হিংসা কোথায় আজ? শত্রু মিত্র, বিধর্ম্মী সধর্ম্মী, ইতর ভদ্র, ছোট বড় সব যে একাকার! রাজপুত মুসলমানের বক্ষে মাথা দিয়া শুইয়া আছে, মুসলমান রাজপুতের হাতে হাত রাখিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের যত বৈষম্য আজ মৃত্যুর সর্ব্বগ্রাসী সাম্যের মাঝে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আজ কোথায় আরম্ভের সেই সমুজ্জ্বল দৃশ্য, সেই বৈচিত্র্যময়ী শোভা, সেই সুসজ্জিত অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, সেই স্বর্ণখচিত পতাকার আন্দোলন, বজ্রমুষ্টিতে সেই সুশাণিত বর্ষা যাহা রবিকরে বিদ্যুদ্বৎ চমকিতেছিল, উজ্জ্বল সারসনে সেই লম্বিত অসি যাহা কোষগহ্বর হইতে ফণীন্দ্রের রসনার মত লক্ লক্ করিয়া বাহির হইতেছিল, সেই সযত্নে আবদ্ধ তূণীর, সেই সুশোভন শরাসন, সেই সৌরকর-প্রতিঘাতী বর্ম্ম, ভূষণ, শর, দণ্ড কোথায়—কোথায় সব? এক্ষণে কোনটা বিচ্ছিন্ন, কোনটা বিভগ্ন, কোনটা মর্দ্দিত, কোনটা স্খলিত, সকলই ধূলি-ধূসরিত, মলিনীকৃত ও বিপর্য্যস্ত। বর্ষা মুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, অসি অসিধারীর নিকট হইতে সরিয়া গিয়া কোথায় কোন আড়ালে পড়িয়া আছে, উষ্ণীষ শির হইতে খসিয়া রক্তাক্ত কর্দ্দমে লুটিতেছে। তীর, ধনু, ভল্ল, সাঁজোয়া, ঢাল নিজ নিজ স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পরস্পরকে জড়াইয়া পাকাইয়া যেন সাক্ষাৎ বিপ্লবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

যেখানে নিশান উড়িয়াছিল, সেখানে শবভুক্ পক্ষিকুল পাক-

শাট মারিতেছে। যে অস্ত্র দেখিলে পশুরাজও ভয় পাইত, ক্ষুদ্রপ্রাণ ফেরুপাল আসিয়া তাহা লেহন করিতেছে। যে স্থান সমরবাদিত্রের গুরুমন্দ্রে কম্পিত হইয়াছিল, সেখানে এক্ষণে শুধু মাংসাহারী পশুর চীৎকার শোনা যাইতেছে। এই দারুণ বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া বিজয়ীর হৃদয়ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ হইল।

সূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ। সায়াহ্নের ছায়া ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে। হামির যুদ্ধপ্রাঙ্গণ দূরে রাখিয়া একটি সংকীর্ণ বনপথ ধরিয়া চলিয়াছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ ও গম্ভীর। সেই নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে দূরাগত মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি সহসা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেখানে লোকালয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। কোথা হইতে এই শব্দ আসিতেছে, ইহা জানিবার জন্য তাঁহার একটু কৌতুহল জন্মিল। হামির শব্দ লক্ষ করিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। শব্দ ক্রমশঃ স্ফুটতর হইতে লাগিল। ক্রমে সেই নির্জ্জন বনমধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীর তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। সেই কুটীর হইতেই যে সেই শব্দ আসিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা গেল। হামির কুটীরের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবার তিনি স্পষ্টোচ্চারিত বাক্য শুনিতে পাইলেন। কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল ভিতরে দুইজনে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এক জনের স্বর ক্ষীণ ভগ্ন ও আর্ত্ত, অপরে যেন পীড়িত শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া কিছু উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছে।

পীড়িতের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "যদি এ জ্ঞান কিছু পূর্ব্বে জন্মিত, তবে হয়তো এতগুলি মানবের রক্তে এই বনভূমি রঞ্জিত হইত না।"

অন্য কণ্ঠ যেন সে কথায় বাধা দিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে। অতীতের চিন্তা এক্ষণে বিস্মৃত হউন।"

প্রথম ব্যক্তি ভগ্নকণ্ঠে যেন আপন-মনে বলিতে লাগিল,— "অতীতই যে এ জীবনের সমগ্র। ইহার ক্ষুদ্র ভবিষ্যৎ যে ক্ষণমধ্যেই অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইবে। কি ভয়ঙ্কর দুরাকাঙ্ক্ষার উপকরণেই না সেই অতীত বিরচিত! এই জীবন-গ্রন্থের প্রত্যেক ছত্র কেবল নীচ স্বার্থের মসীতেই অনুলিপ্ত, ইহার কোথাও যে একটি উচ্চতর বৃত্তির রেখাপাত খুঁজিয়া পাই না। আজ শেষ দিনে অতীতের কোন শুভ চিহ্ন স্মরণ করিয়া বিদায় লইব!"

কথা বলিতে বলিতে পীড়িতের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে যেন কিছু পানীয় সেবন করাইল। পরে কোমলকণ্ঠে কহিল,—

"বেশী কথা কহিলে, পিপাসা ও ক্লান্তি আর বৃদ্ধি পাইবে। শান্তভাবে অবস্থান করুন। ক্লেশের উপশম হইবে।"

হামির নির্ব্বাক ও নিশ্চলভাবে একই স্থানে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন। কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিবেন কিনা ভাবিতেছেন। আবার সেই স্বর তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল। এবারে স্বর যেন আরো ভগ্ন, কথাগুলো যেন অধিকতর ক্লেশোচ্চারিত।

পীড়িত বলিল, "যে ক্লেশে হৃদয় পুড়িতেছে, সে ক্লেশের যে শান্তি নাই। অশুভ গ্রহের মত ধরণীতে আসিয়াছিলাম। কত জনের কত অমঙ্গল ঘটাইলাম। নিজের স্নেহের সন্তান সে কি আজ অকালে প্রাণ হারাইত। আমারই বিষময়

সংসর্গে সে যে জর্জ্জরিত হইয়া শুকাইয়া গেল। হা পুত্র হরিসিংহ !”

মুমূর্ষুর স্বর একটু থামিয়া আবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাহির হইতে লাগিল,—“শুভক্ষণে, বনবীর, তুমি এই অশুভের সংসর্গ ছাড়িয়াছিলে, তাই আজ এই শেষ দিনের শয্যাপ্রান্তে তোমাকে দেখিতে পাইলাম। পুত্র তুমি, পিতার দুরাচার মার্জ্জনা করিয়াছ। কন্যা শিবানীও পিতার প্রতি রোষ পোষণ করিবে না। কিন্তু একজনের কাছে ক্ষমা চাহিবার অবসর পাইলাম না। তিনি প্রকৃত রাজপুত, উদারাত্মা বীরপুরুষ, অন্তিমে একবার তাঁহার দেখা পাইলাম না। বনবীর, বীরকেশরী হামিরকে এই মুমূর্ষুর শেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিও। বনবীর—।”

পীড়িতের আবার যেন বাক্‌রোধ হইল। হামির এবার ধীরপদে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কুটীরতলে মালদেব শয্যায় শায়িত। বনবীর শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া, মুমূর্ষুর প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছেন। এই কুটীর কোন অরণ্যবাসীর পরিত্যক্ত আবাসস্থান। বনবীরই যুদ্ধস্থল হইতে আহত মালদেবকে এই স্থানে আনিয়া শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

হামির ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মৃত্যুর ছায়া মালদেবের বদনমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই করুণ দৃশ্যে হামিরের হৃদয় গলিল। তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—

“রাজন্, অনুতপ্তের প্রতি ভগবান সদয়, মানুষ কেন কঠোর আচরণ করিবে।”

বনবীর নতমুখে বসিয়াছিলেন, হামিরের কথায় চমকিত

হইয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। মালদেবেরও ক্ষীণ দৃষ্টি হামিরের দিকে আবদ্ধ হইল। প্রথমে তাঁহার বদনে একটু যেন চিন্তারেখা ফুটিল, কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই তাহা প্রফুল্ল হইল। মালদেব কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বনবীর তাহার মুখে পানীয় দিলেন। মুমূর্ষু তাহা কতক গলাধঃকরণ করিলেন, কতক ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া পড়িয়া গেল। মালদেব প্রথমে হামিরের দিকে কর প্রসারিত করিলেন। হামির জানু পাতিয়া তাহা সাগ্রহে ধরিলেন। অপর করে বনবীরের হাত ধরিয়া মালদেব হামিরের হস্তে তাহা ন্যস্ত করিলেন। কি এক অব্যক্ত প্রার্থনা মুমূর্ষুর অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে প্রকাশ পাইল।

সূর্য্য অস্তমিত হইল। পক্ষীরা নীড়াভিমুখে ফিরিল। মালদেবের জীবনসূর্য্যও ডুবিয়া গেল। আত্মপক্ষী কোন্ নীড়ের অন্বেষণে কোথায় চলিল?

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

হামির সদলে চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আজ দরবারের দিন। প্রাসাদের সংলগ্ন বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সমুজ্জ্বল চন্দ্রাতপতলে এই দরবারের বৈঠক বসিয়াছে। ঝালরে, পতাকায়, ফুলের মালায় চারিদিক অপূর্ব্ব শোভা ধরিয়াছে। মহারাণা হামির মণিমুক্তাখচিত মণ্ডপের নিম্নে সিংহাসনে অধিরূঢ়। তাঁহার দুই পার্শ্বে সামন্তগণ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট

রহিয়াছেন। পশ্চাতে যবনিকার অন্তরালে পৌর স্ত্রীবর্গের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সামন্তগণের পরেই সাধারণ প্রজাবর্গ অবস্থিত। মণ্ডপের পুরোভাগে কাতারে কাতারে সৈন্যবৃন্দ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ক্রমে কার্য্যারম্ভ হইল। বিগত যুদ্ধে যে সকল বীর চিতোর-রক্ষার্থ পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহাদের গুণগ্রাম বিঘোষিত হইল। হামির তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদিগের সহায়হীন পরিবার বর্গের সাহায্যার্থ যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেও ভুলিলেন না। তৎপরে জীবিতদিগের কার্য্যেরও প্রশংসাবাদ করা হইল। কাহাকেও ভূমি, কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও উচ্চপদ, কাহাকেও উপাধি বিতরণ দ্বারা হামির সকলকে পুরস্কৃত করিলেন। কেবল উচ্চ কর্ম্মচারী ও সামন্তগণই এই পুরস্কার লাভ করিল না, পরন্তু সাধারণ সৈনিকদলের মধ্যেও ইহা মুক্তহস্তে বণ্টন করা হইল।

পুরস্কারবিতরণ শেষ হইয়া আসিলে, হামির জলধরকে আহ্বান করিলেন। জলধর নিকটেই আসীন ছিলেন, হামিরের সম্ভাষণে তাঁহার পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

হামির হাসিয়া প্রীতিপূর্ণস্বরে কহিলেন, "জলধর, আমরা মন্ত্রণা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সকলেরই কিছু না কিছু ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু একজন বাকি পড়িয়াছে। তাঁহার বিষয় এই সভাতলেই নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়াই মুলতুবি রাখা হইয়াছে। সে সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি?"

জলধর বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "মহারাণার যেরূপ অভিরুচি।"

হামির। আমি তাঁহাকে অমাত্যপদে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এক্ষণে কেবল তাঁহার সম্মতির অপেক্ষা।

জলধর কিছু চিন্তামগ্ন হইলেন। হামিরের কথার তিনিই যে লক্ষ্যস্থল, তাহা বুঝিলেন। কি উত্তর দিবেন, সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। কিন্তু কোন উত্তর না দেওয়াও অভদ্রতা। তাই একটু ভাবিয়া বলিলেন,—

"আদেশ করুন। তাঁহাকে মহারাণার সমীপে আনয়ন করি।"

হামির স্মিতমুখে বলিলেন, "তিনি সম্মুখেই আছেন। আমার, অভিপ্রায় ও সামন্তগণের পরামর্শানুসারে আমি তোমাকেই মিবারের মন্ত্রিত্ব প্রদান করিলাম।"

হামিরের প্রস্তাবে চতুর্দ্দিক হইতে সমর্থনাসূচক শব্দ উত্থিত হইল। সিংহাসনের ঠিক পার্শ্বদেশে মন্ত্রীর আসন শূন্য রাখা হইয়াছিল। হামির হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক জলধরকে তথায় সংস্থাপিত করিতে গেলেন। কিন্তু জলধর তৎক্ষণাৎ জানু পাতিয়া করযোড়ে হামিরের সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। কিছু কাতরতাপূর্ণ আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—

"মহারাণা, দাসের কিছু বক্তব্য আছে।"

হামির। বল।

জলধর। মহারাণার দান শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। কিন্তু তাহা পুনরায় মহারাণার চরণতলেই রাখিতে অনুমতি প্রার্থনা করি।

জলধরের আচরণে সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইল। হামিরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কারণ কি, জলধর ?"

জলধর বিনীতভাবে অথচ দার্ঢ্য সহকারে কহিলেন, "চিতোরের উদ্ধারের পর জীবনের বোঝা অনেকটা লঘু হইয়াছে। যদি আদেশ পাই, তবে এক্ষণে তীর্থদর্শনে যাত্রা করিব।"

হাম্মির। কত দিন লাগিবে?

জলধর। কিছুরই স্থিরতা নাই। হয় তো নাও ফিরিতে পারি।

হাম্মির এবার কথঞ্চিৎ ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "জলধর, তোমার পক্ষে এমন নির্ব্বেদের হেতু তো কিছু খুঁজিয়া পাই না।"

জলধর অবনতবদনে রহিলেন। কি উত্তর দিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী চপলার সহিত জলধরের সন্নিকটেই বসিয়াছিলেন। চপলা অনূঢ়া ও সন্ন্যাসীর কন্যা, তাই সে এরূপ সভাস্থলেও পিতার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত। জলধরকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া বলিলেন,—

"উদাসীনের ধর্ম্ম সকলের পক্ষে প্রশস্ত নহে।"

জলধর এবার বুঝি পথ পাইলেন। বলিলেন, "গুরুদেব, এ দাসকে কি পৃথক করিয়া ধরিতে পারা যায় না?"

সন্ন্যাসী। পৃথকের চিহ্ন পৃথক। তোমাতে সে লক্ষণ নাই। সংসার ও সমাজের ভারবহন করাই তোমার একান্ত কর্ত্তব্য।

জলধর এতদিন হৃদয়ে নৈরাশ্য বহন করিয়াও চিতোরের মঙ্গলার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, শেষ যুদ্ধেই জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই। আজ সংসার হইতে দূরে থাকিয়া নিজের সন্তপ্ত প্রাণ কথঞ্চিৎ শীতল করিতে ইচ্ছুক। গুরুজনেরা তাঁহার সে পথেও

অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছেন। জলধর বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন। তাঁহাদের কাছে নিজের চিত্তোদ্বেগের হেতু প্রকাশ করাও অসম্ভব। জলধর উপায়ান্তর না দেখিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন,—

"মহারাণা, গুরুদেব, এ অধীনকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মুক্তি দিন। এ দাস অধুনা কর্ত্তব্যের ভারবহনে নিতান্ত অক্ষম।"

হাম্মির পূর্ব্বেও জলধরের এই সংসারবৈমুখ্যের আভাস কখন কখন পাইতেন, কিন্তু তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাহা ক্ষণিক খেয়াল বলিয়াই উড়াইয়া দিতেন। এক্ষণে জলধরের এই দার্ঢ্য ও আকুলতা দেখিয়া, তিনি যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সন্ন্যাসী কিন্তু সহাস্য ও স্বাভাবিকস্বরে জলধরকে বলিলেন,—

"ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু মহারাণার কাছে মুক্তি পাইবার আগে সন্ন্যাসীর কিছু দান গ্রহণ করিতে পারিবে?"

কথাটা সকলেরই কাছে কিছু হেঁয়ালীর মত লাগিল। জলধরও ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটনে অক্ষম হইয়া নিরুত্তরে কেবল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, জলধর। সন্ন্যাসীর অমাত্যের প্রয়োজন হয় না। সন্ন্যাসীর দান মন্ত্রিত্বের মত ভয়াবহ ঠেকিবে না। একদিন তোমার এইরূপ নৈরাশ্য দেখিয়া, সেই নৈরাশ্যের মুক্তিমন্ত্রে তোমাকে ভবিষ্যতে দীক্ষিত করিব, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। আজ তাহা পূর্ণ করিব। যাহা দিতেছি, তাহা মন্ত্র না হইলেও, মন্ত্রেরই মত তোমার সমগ্র জীবন পরিবর্ত্তিত করিবে।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী জলধরের দক্ষিণ কর গ্রহণ করিয়া পার্শ্বস্থিতা নিজতনয়া চপলার বাম হস্ত তদুপরি অর্পণ করিলেন।

ইহা দর্শন করিয়া বিস্ময়ের প্রবল আবেগে সভাস্থ লোকসমূহ স্তম্ভিত হইয়া গেল। হামির কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিতনেত্রে সন্ন্যাসীর প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। জলধরের হাত কাঁপিয়া উঠিল। তিনি প্রথমে যেন হাত সরাইবার মত চেষ্টা করিলেন. কিন্তু কেহ ধরিয়া না থাকিলেও, তাহা সরাইতে সমর্থ হইলেন না। কি যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে তাহা আবদ্ধ রহিল।

হামির কিয়ৎক্ষণ পরে কিছু অনুযোগের ভাবে কহিলেন, "একি ব্যাপার গুরুদেব, মানুষ লইয়া কি এমন ক্রীড়া কখন সম্ভবে ?"

সন্ন্যাসী। উন্মত্ত ভিন্ন এমন বিদ্রূপ কেহ করিতে পারে না। উভয়ের হৃদয় বুঝিয়া আমি উভয়কে সত্য বন্ধনেই বাঁধিয়াছি।

হামির এবার কিছু রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "ব্রাহ্মণকন্যার সহিত ক্ষত্রিয়ের মিলন! এ সন্ন্যাসীর স্বপ্নরাজ্য নহে। এ রাজপুত্রের বিবারভূমি।"

সন্ন্যাসী স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মহারাণা, আশ্বস্ত হউন। চপলা ব্রাহ্মণকন্যা নহে। এই সন্ন্যাসী অজয়সিংহের পুত্র অরিমসিংহ।"

সন্ন্যাসীর অসম্ভব কার্য্যজনিত প্রথম বিস্ময় অপনীত হইল বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীর আত্মপরিচয়ে আর একটা প্রবলতর বিস্ময়ের

তুফান যেন সভা আন্দোলিত করিয়া তুলিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—

"পিতৃদেব যখন নিজের পুত্রদের অযোগ্যতা দর্শনে বহু অন্বেষণের পর হাম্মিরের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন, তখন আমাদের হৃদয় হইতে সিংহাসনের সকল আশা প্রায় তিরোহিত হইল। সুজনসিংহ দেশান্তরিত হইলেন। আমিও ভগ্নচিত্তে কৈলবারার প্রান্তভাগে গিয়া বাস করিলাম। কিছুদিন পরে হাম্মিরের আগমনসংবাদ পৌছিলে, আশার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া গেল। ক্ষোভে ও দুঃখে মর্ম্মাহত হইলাম। আবার বিপদের উপর বিপদ ঘটিল। ইতিমধ্যে পত্নী একটি কন্যার জন্মের পর হইতে অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিয়দ্দিনের মধ্যেই তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন। চারি দিক হইতে নৈরাশ্য ও বিষাদের ঘন আঁধার যেন ঘনাইয়া আসিল। সংসারে আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। একদিন ঘোর নিশীথে কন্যাটিকে বক্ষে করিয়া আবাসস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম। এই আকস্মিক নিরুদ্দেশে আমার মৃত্যুসংবাদই দেশময় প্রচারিত হইল। ইহার পর দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালায় কত দেশ দেশান্তর ঘুরিলাম, কিন্তু শান্তি কোন স্থানেই মিলিল না। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। শেষে একজন অসাধারণ ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি এক অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, সাধনে যেরূপ সিদ্ধ জ্ঞানেও তদ্রূপ উন্নত। সত্যই তাঁহার সংসর্গ যেন আমার পক্ষে স্বর্গবাস বলিয়া মনে হইল। তাঁহার চরণতলে বহুদিন কাটাইলাম।

ক্রমে চিত্তের সমস্ত ক্ষোভ তিরোহিত হইল। নূতন জীবনে তিনি যেন আমাকে সঞ্জীবিত করিলেন। উদাসীনের পন্থা ত্যাগ করাইয়া তিনি আমাকে লোকসেবায় ও সমাজের হিত-সাধনে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারই আদেশে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও গৃহী হইলাম। সমাজের সেবার্থ আমি এই ছদ্মবেশেই আবার কৈলবারায় সসন্তানে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সাধ্য, তাহা করিয়াছি।"

হাম্মির তন্ময়চিত্তে সন্ন্যাসীর কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার বাক্য শেষ হইলে সিংহাসন হইতে উঠিয়া সন্ন্যাসীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। মস্তক হইতে মুকুট উন্মোচন করিলেন। পরে ধীরে ধীরে তাহা সন্ন্যাসীর চরণতলে রাখিয়া যুক্তকরে কহিলেন,—"অগ্রে আপনাকে গুরুরূপে পাইয়াছিলাম, আজ গুরু ও প্রভু উভয়ই লাভ করিলাম! চিতোরের সিংহাসন আপনারই প্রাপ্য। ভগবানকে ধন্যবাদ যে মিবারের শাসন-ভার যোগ্যকরেই ন্যস্ত হইল।"

হাম্মিরের এই অসামান্য আচরণে সভাস্থ লোক অবাক হইয়া রহিল। সন্ন্যাসী ধীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"হাম্মির, যে বংশে উন্নতচরিত্র স্বার্থত্যাগী মহাত্মগণ উদ্ভূত হইয়াছেন, তোমার এই আচরণ তাহারই যোগ্য, ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু, হাম্মির, চিতোরের সিংহাসনে আমার অধিকার কি? যিনি চিতোরের উদ্ধারকর্তা, তিনিই ইহার যথার্থ অধিপতি।"

হাম্মির। মহাভাগ, তাহাই যদি হয়, কিন্তু এই চিতোরের উদ্ধার কি আপনার সাধনা ব্যতীত হইতে পারিত। আমরা

উপলক্ষমাত্র, আপনিই ইহাকে শত্রুর লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী সহাস্যে কহিলেন, "হাঁ, কাষ্ঠমার্জ্জার সীতার উদ্ধারে যতটা করিয়াছিল, আমার শক্তি সেইরূপ কিছু করিয়া থাকিবে। যাক সে কথা। হামির, একদিন এই সিংহাসনের জন্য শোকে ও দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। কিন্তু যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছ, ভগবৎকৃপায় সে সেই পুরাতন আজিমসিংহ নহে। সেই মহাপুরুষের শিক্ষায় তাহার জন্মান্তর ঘটিয়াছে। সে আর সন্ন্যাসীর গৈরিক ছাড়িয়া চিতোরের কেন, সমগ্র ভারতেরও সিংহাসন লইতে পারে না। মহারাণা, তুমি রাজপুতের গৌরব, আমাদের কুলের ধুরন্ধর, আশীর্ব্বাদ করি, এই মুকুট তোমারই মস্তকে বিরাজিত থাকিয়া মিবারভূমি প্রভান্বিত করুক।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী ভূমিতল হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়া হামিরের শিরে পরাইয়া দিলেন। সভার চতুর্দ্দিক আজিম-সিংহের প্রতি ভক্তিপূর্ণ সাধুবাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরিশিষ্ট।

কিছুকাল কারাভোগের পর মহম্মদ খিলিজি কয়েকটা প্রদেশ, কিছু অর্থ ও একশত হস্তী নিষ্ক্রয়স্বরূপ দিয়া মুক্তি পাইলেন। কিন্তু বিদায়কালে ভাবে ভঙ্গাতে মহম্মদ দেখাইলেন, যেন ভয়ে পড়িয়াই দিল্লীর বাদশাহকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। হামির তাহা বুঝিয়া একটু মিঠাকড়া ভাষায় দিল্লিপতির সে ভ্রান্তিটুকু শুধরাইতেও বিরত হইলেন না। চিতোর যে ভবিষ্যতেও পুনরায় তাঁহার এরূপ অভ্যর্থনার নিমিত্ত বিশেষভাবে সসজ্জ থাকিবে, ইহা বাদশাহকে স্পষ্টরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

জলধরের বৈরাগ্যব্যাধি কাটিয়া গেল। সেই সভাস্থলে মহারাণা হামিরের অমাত্যের আসন আর শূন্য রহিল না। কিন্তু জলধর যেমন এ ক্ষেত্রে একের দক্ষিণ পার্শ্ব পূর্ণ করিলেন, ক্ষেত্রান্তরে তাঁহারই বামপার্শ্ব আবার অপরে অধিকার করিয়া বসিল। তাই বুঝি চপলার উপাধি হইল সচিবের সচিব। বিশেষরূপেই জানা গিয়াছে, শান্তাই এই উপধির আবিষ্কর্ত্রী, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় ইহার বিতরণ-উপলক্ষে গায়ক গণেশপ্রসাদ যে মেঘ ও তড়িতের উপমা দিয়া আলঙ্কারিক ভাষার একটি সঙ্গীত করিয়াছিলেন, তাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

যথার্থ বীরের হৃদয় কখন বিদ্বেষ পুষিয়া রাখে না। মুমূর্ষু মালদেবের শয্যাপ্রান্তে হামির যে ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুধু সাময়িক ভাবুকতাবশে নহে। তিনি বনবীরকে নিমচ, জিরণ প্রভৃতি কয়েকটা জনপদ ভূমিবৃত্তি দিয়া যথাযোগ্য

ভাবেই সামন্তপদে অবস্থাপিত করিলেন। বনবীর কখন মিবার-ভূমিকে পৈতৃক অধিকার বলিয়া মনে করেন নাই, রাণাবংশকেই তিনি ইহার প্রকৃত অধিকারী বলিয়া জানিতেন। বলা বাহুল্য, বনবীর আজীবন অক্ষুব্ধভাবে হাম্বিরের বশ্য সামন্তরূপে সেই মিবারভূমির উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর আর পূরা আজিমসিংহ হইলেন না। গৈরিক, দণ্ড ও কমণ্ডলু তাঁহাকে আর ছাড়িল না। অবশ্য, কম্বল ছাড়িতে গেলেও কম্বল ছাড়ে কৈ, এরূপভাবেও এগুলো তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিল না। তিনি স্বেচ্ছায়ই তাহাদের সঙ্গত্যাগে বিমুখ রহিলেন। তবে সন্ন্যাসী রহিয়াও তিনি কখন লোকালয় পরিত্যাগ করেন নাই। কখন দেশ বিদেশে বেড়াইতেন, কখন বা চিতোরে আসিয়া অবস্থান করিতেন।

সমাপ্ত।